ভদ্রা।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ,
প্রণীত।

Calcutta
S. K. LAHIRI & CO.
54, College Street
1908

মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

Calcutta
Printed by Atul Chandra Bhattacharyy
57, Harrison Road.

বিজ্ঞপ্তি।

উৎসব পত্রিকায় ভদ্রা প্রকাশিত হয়। যাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য ইহার এত শীঘ্র পুনঃ মুদ্রনের অন্যতম কারণ।

অন্য দেশে বিবাহ, ভালবাসার পূর্ণাহুতি। আমাদের দেশে বিবাহ ভালবাসার বীজ। অন্য দেশে প্রায়শঃ বিবাহ পর্য্যন্ত দেখাইলেই সব দেখান হইল। আমাদের দেশে বিবাহ পর্য্যন্ত দেখাইলে কিছুই দেখান হইল না। যে সমস্ত উপন্যাসে বিবাহ পর্য্যন্তই দেখান হয় সেগুলি প্রায়ই বিদেশীর অনুকরণ। ইহা এই কালের ধর্ম্ম মধ্যে আসিতেছে। "ভদ্রাতে" কাল ধর্ম্মের মত কিছু আছে। এই অংশটুকু আমার দেশের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত, ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রয়োজনীয় অংশটুকু বলা হইয়াছে। সেই জন্য পরিশিষ্ট বৃহদায়তন হইল।

সংযম শূন্য বিবাহ, সংযম শূন্য ভালবাসা, প্রকৃত বিবাহ নহে, প্রকৃত ভালবাসা নহে। যে বিবাহে সংযম অভ্যাস হয় না সে বিবাহ সুখের হইতে পারে না। স্বামী ভিন্ন সংযম অভ্যাস করাইতে আর কাহারও সাধ্য নাই, সংযম শিক্ষা যে সে দিতে পারেন, অভ্যাস করাইতে স্বামীই সমর্থ।

যৌবনই সংযম অভ্যাসের প্রকৃত সময়। বৃদ্ধকালের শক্তি-হীনতা সংযম নহে। প্রাচীন সময়ে সংযমের শিক্ষা ছিল, অভ্যাস ছিল, এখন প্রায়ই নাই। সংযম আবার সর্ব্বসাধারণে আদৃত হউক ইহাই প্রার্থনা। ভদ্রাতে ইহার কতক আভাষ দেওয়া গেল। সংযমই প্রকৃত জাতীয়তা।

ভালবাসা শূন্য বিবাহ অস্বাভাবিক। যে ফুলটি যত সুন্দর তাহার বিকৃতিও তত সহজেই ঘটে। বিবাহ জীবনে ভালবাসার বিকৃতি না ঘটে তজ্জন্য বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক। এ শিক্ষা আধুনিক সমাজে নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য যুবকের চরিত্র গঠনের নিতান্ত উপযোগী। এখন স্বামী ও স্ত্রীকে নিজের চেষ্টায় সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। আমার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস ভদ্রা এই সংযম শিক্ষা বিষয়ে সংযম প্রার্থীর সহায়তা করিবে।

"কটন প্রেসের" উৎসাহশীল ম্যানেজার আমার নিতান্ত স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ, ভদ্রার মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে এতদূর উদ্যোগী না হইলে "ভদ্রা" এত শীঘ্র এভাবে প্রকাশিত হইত না। এত যত্ন করিয়া ভদ্রার প্রুফ দেখা, এত আগ্রহ করিয়া ভদ্রা প্রচারে যত্ন করা ইহার জন্য আমি ঋণী রহিলাম। ইতি সন ১৩১৪ সাল তারিখ ২০শে পৌষ।

গ্রন্থকার

উৎসর্গ।

খণ্ড অখণ্ডে, পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্নে

উৎসর্গীকৃত হইল।

ঘরে ঘরে পতি-নারায়ণ ব্রত

প্রতিষ্ঠা হউক ইহাই প্রার্থনা।

সূচনা।

"যব গোবিন্দ দয়া করি তব গুরু মিলি যায়"।

গোবিন্দ যখন দয়া করেন, তখনই গুরু মিলে। পতিই স্ত্রীলোকের গুরু। বালিকাকালে ব্রত পূজা ইত্যাদি গোবিন্দ কৃপালাভ জন্য। গোবিন্দকৃপায় যে পতি লাভ হয় তিনিই পতি, তিনিই গুরু। পতি ও গোবিন্দ এক। পতি ও গোবিন্দ উভয়েই যখন উপস্থিত, তখন পতির বন্দনাই কর্ত্তব্য। কারণ, পতিই গোবিন্দ দেখাইয়া দিয়া থাকেন।

ভদ্রা এই তত্ত্বের বিকাশ মাত্র। ভদ্রার জীবনে স্ত্রী-শিক্ষার সমৃদ্ধ উপাদান রহিয়াছে। এইজন্য ভদ্রা-লীলার আয়োজন। কিন্তু ভদ্রা কি কাল্পনিক? এই প্রশ্নের উত্তর মহাভারত করিবেন।

দ্রৌপদী স্বয়ম্বরের পর পাণ্ডবেরা অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপিত হইল। পাঞ্চালীর জন্য ভ্রাতৃ-বিরোধ না হয় এই হেতু মহর্ষি নারদ উপদেশ করিয়া গেলেন। পাণ্ডবেরা নিয়ম করিলেন "আমাদের মধ্যে একজন যখন দৌপদীর নিকটে থাকিবে তখন অন্য জন তথায় যাইতে পারিবে না।" যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইতে হইবে। ব্রহ্মচারী দুই প্রকার, নৈষ্ঠিক এবং উপকুর্ব্বাণ। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াও একরূপ ব্রহ্মচর্য্য আছে। অর্জ্জুন এক ব্রাহ্মণের জন্য নারদ-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিলেন।

দ্বাদশ বৎসর বনবাস তাঁহার হইল। গৃহস্থ ব্রহ্মচারীর বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। অর্জ্জুন বনবাসকালে তিনটী বিবাহ করেন। দশ বৎসর ধরিয়া বহু তীর্থ পর্য্যটনের পর অর্জ্জুন প্রভাসে আসিলেন। প্রভাস হইতে দ্বারকায় সংবাদ গেল, তখনও রৈবতকে উৎসব আরম্ভ হয় নাই। কৃষ্ণ প্রভাসে আসিলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত কিছু দিন রৈবতকে বাস করিলেন। পরে উভয়ে দ্বারকায় গমন করেন।

দ্বারকায় অবস্থিতি কালে রৈবতকে মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে রৈবতকে আসিলেন। উৎসব-সমাজে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে প্রথম দর্শন করেন। অর্জ্জুনই প্রথমে অনুরাগী হইয়াছিলেন। সুভদ্রার বিবাহ জন্য স্বয়ম্বরের আয়োজন হইবে, অর্জ্জুন ইহাও অবগত ছিলেন। রৈবতক হইতেই অর্জ্জুন কৃষ্ণের অনুজ্ঞায় সুভদ্রাকে হরণ করেন। অন্য অন্য যাদবেরা পূর্ব্বে ইহা অবগত ছিলেন না। ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়েরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমরসজ্জা করেন। বলদেব কৃষ্ণকে মৌনী থাকিতে দেখিয়া কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন, এবং অর্জ্জুনকে বহু প্রকার নিন্দা করেন। কৃষ্ণ যাদবদিগকে শান্ত করেন, পরে অর্জ্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অর্জ্জুনের সহিত ভদ্রার যথারীতি পরিণয় হয়। অর্জ্জুন দ্বারকায় দশম বৎসর অতিবাহিত করেন। একাদশ বৎসর পুষ্করে অতিবাহিত হয়। দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে খাণ্ডব-প্রস্থে পুনরায় আগমন করেন। সঙ্গে সুভদ্রাও আসিল। রক্তবস্ত্র-পরিধানা সুভদ্রাকে গোপালিকার বেশ ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভদ্রাকে পাইয়া কুন্তীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে ঈষৎ প্রণয়কোপ দেখাইতে

ক্রুটী করেন নাই। পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ নির্বিঘ্নে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছেন শুনিয়া বসুদেব, বলদেব ও অন্যান্য যাদব বীরগণ বহুল যৌতুক গ্রহণ পূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করেন।

ভদ্রা-লীলার ইহাই ঐতিহাসিক অংশ। আমরা মহাভারত হইতে ইহার উল্লেখ করিলাম। ভক্ত কাশীরাম দাস গল্পটীকে নিজের ইচ্ছামত সজ্জিত করিয়াছেন, মূলের সহিত সর্ব্বথা সাদৃশ্য না থাকিলেও কাশীরামের সুভদ্রাহরণ আধুনিক উপন্যাসের মত। কাশীরাম প্রথমেই সুভদ্রাকে আসক্ত দেখাইয়াছেন। মূলে প্রথম অসক্তি অর্জ্জুনের। এই পার্থক্য থাকাতে কাশীরাম কৃত ভদ্রা-চরিত্র অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। আমরা ভদ্রা-চরিত্র যাহা বুঝিয়াছি মূলের সহিত ঠিক রাখিয়া কাশীরামের গল্পাংশ হইতে শেষ বিবরণটী মাত্র গ্রহণ করিয়াছি। কাশীরামের স্বকপোল-কল্পিত হইলেও কাশীরাম হইতে যাহা আমরা গ্রহণ করিলাম তাহাতে ভদ্রা-চরিত্রের কোন বিপর্য্যয় ঘটে নাই। দুর্য্যোধনের সহিত ভদ্রার বিবাহ প্রস্তাব ভাগবতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত যদুবালকদিগের যুদ্ধ এবং ভদ্রার সারথ্য ইহা আমরা কাশীরাম হইতে গ্রহণ করিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়গুলিতে ঋষিদিগের পথ সাধ্যমত অনুসরণ করা হইয়াছে। স্বরূপ বিস্মৃতি ভিন্ন পতন নাই, স্বরূপ দৃষ্টি ভিন্ন উত্থান নাই। কল্পনার মধ্য দিয়া গমন করাই ভক্তি মার্গ। শেষের অধ্যায়গুলি সাধনার সহিত জড়িত। একবার পাঠ করিয়া ক্ষণিক চিত্তবিনোদন ইহাদের উদ্দেশ্য নহে। অনুষ্ঠানের ব্যাপার ইহাদের মধ্যে অনুস্যুত। মানব জীবনের নিতান্ত জটিল কথা—সর্ব্বকালে নিত্য, সকলের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা

করা হইয়াছে—সুধী পাঠক ও পাঠিকা মহোদয় ও মহোদয়াগণ এইটী লক্ষ্য রাখিয়া পরিশিষ্ট অংশ পাঠ করেন ইহাই গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

ভদ্রা।

প্রথম অধ্যায়।

সাগর তটে।

ফাল্গুন মাস। আজ দোল পূর্ণিমা। এখনও চন্দ্রোদয় হইতে বিলম্ব আছে। উপরে পশ্চিম আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কুঙ্কুমবর্ণের মেঘ খেলিতেছে, আর নীচে একটি কিশোরী সমুদ্র-তীরে খেলা করিতেছে।

মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের মত সাগর-লহরী বেলাভূমির উপর কতক দূর আসিতেছে আবার পরক্ষণেই সমুদ্র ক্রোড়ে ছুটিয়া যাইতেছে। সাগর বড় লোক, বড় অহঙ্কারী। বিদ্যাভিমানী যেমন কাহারও বাক্য গ্রহণ করিতে চায় না, নিজের কথাই সকলকে শুনাইতে চায়, অভিমানী সমুদ্রও তেমনি কাহারও কিছু গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। আদর করিয়া তুমি সমুদ্রকে কিছু দাও, সমুদ্র তীরে ফেলিয়া দিয়া যায়। নিজের হৃদয়ে কত কি পূরিয়া রাখিয়াছে, প্রতিশ্বাসে তীরপ্রদেশে কত সুন্দর পদার্থ দিয়া যাইতেছে।

কিন্তু সমুদ্র বড় অশান্ত। সাগরের এ অশান্তি কেন? কিসের অভাব সাগর নিরন্তর অনুভব করিতেছে? বিনা অভাবে চলন হয় না। সাগর যে সর্ব্বদাই চলিতেছে। যাহা অভাব-শূন্য তাহাই পূর্ণ, তাহাই শান্ত। সাগরের অভাব কি? বক্ষে শত শত নদী ধারণ করিয়াও সমুদ্রের ক্ষণিক একদেশ শান্তি ভিন্ন

পূর্ণ-শান্তি নাই। উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া আপন বক্ষে আপনি আছাড় কাছাড় খায়, তথাপি নদীর মত সীমা অতিক্রম করে না। সাগর একবার মাত্র সীমা অতিক্রম করে সে কেবল মিলনের সময়ে—সে কেবল মহাপ্রলয়ের সময়ে—তাহাকে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারে না বলিয়াই তখন সীমা অতিক্রান্ত হইয়া যায়। নতুবা বিশাল সমুদ্র বিশাল পিপাসা হৃদয় মধ্যে পূরিয়া রাখে।

এই সীমাশূন্য জলরাশি আবার কোন সীমাশূন্য বস্তুর সহিত মিশিতে চায়? যে যত ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক এই বিশ্বে কেহই শান্ত নহে—কেহই স্থির নহে। অতি ক্ষুদ্র জলকণাও অনন্ত সাগরে মিশিতে চায়, অতি ক্ষুদ্র মানবও বিশাল মানব-জাতির সহিত মিশিয়া কোন এক অনন্ত পদার্থের পানে ছুটিতে চায়।

মহান্ সমুদ্র কোন্ মহীয়ান্ অনন্তের আহ্বানে ব্যাকুল? যখন অনন্তে অনন্তে মিলন হয় তখন প্রাণ জুড়ায় নতুবা ঐ হা হুতাশ, ঐ আছাড় কাছাড়। যে যত বড়, তার জ্বালাও তত বেশী, তার ধৈর্য্যও তত অধিক। সাগরের মত না হইলে সাগরের ধৈর্য্য বুঝা যায় না।

এই সাগরতরঙ্গভঙ্গে কি আছে? আছে কিছু, নতুবা সুখী দুঃখী প্রেমিক অপ্রেমিক সকলেই স্থির হয় কিসে? সাগরের তুলনায় তরঙ্গ কি? এক হইয়াও পৃথক হইয়া যখন তাহার বিশাল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে তখন কত লোকে কত কি দেখে। নতুবা বড় বড় তরঙ্গ সাগরবক্ষে উঠিতেছে ভাঙ্গিতেছে ইহাতে তোমার আমার কি? সমদ্রের নিকট যাও, সমুদ্র তোমার অশান্ত হৃদয়কে ক্ষণকালের জন্যও শান্ত করিতে পারে।

সাগরের রূপ বড় সুন্দর। সাগরের কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর। সাগর আপন রূপরাশি দিয়া, আপন সুন্দর গম্ভীর স্বর দিয়া

মানুষের চক্ষু ও কর্ণকে ডুবাইয়া রাখে। দূরে তরঙ্গভঙ্গ লক্ষ্য কর, তরঙ্গ ভাঙ্গিতেছে আর নীলাম্বুবক্ষে শুভ্র পুঞ্জীকৃত পুষ্পদাম, মালার আকারে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে—মিলন-আশা-ব্যাকুল রমণীহৃদয়ে হার গুচ্ছের মত উঠিতেছে পড়িতেছে। এক ছড়া মালার কোলে কোলে আর এক ছড়া মালা সাগরবক্ষে বড় সুন্দর দেখায়। তরঙ্গভঙ্গরূপ নিশ্বাস ত্যাগে বক্ষের উপরে পুঞ্জীকৃত মালা উঠিতেছে, লয় হইতেছে। এই এক দৃশ্য। সেই ফেনরাশি মালার আকারে দুলিয়া দুলিয়া অদৃশ্য হইতেছে,—অনন্তকাল ধরিয়া এই এক দৃশ্য ছুটিতেছে। এই দৃশ্য মানব-চক্ষে কত কি সৌন্দর্য্য আঁকিয়া দিয়া যায়। কখন এ রূপরাশি পুরাতন হয় না। রূপের পর কণ্ঠস্বর। এমন কর্ণতৃপ্তিকর সাগরগর্জ্জন—যেন কর্ণ আর কিছুই শুনিতে চায় না। মনুষ্যের চক্ষুকর্ণকে, সমুদ্র সর্ব্বদা রূপ ও শব্দে ডুবাইয়া রাখে, সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়কে অন্য বিষয় হইতে নিগ্রহ করে। যাহা কিছু মানবের প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্য বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া আপনার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে, তাহাই মানবের আরামের বস্তু। আরাম কোথাও ক্ষণিক, কোথাও বহুক্ষণস্থায়ী, কোথাও চিরস্থায়ী।

সাগর এক মহাশক্তির খেলা, এই মহাশক্তি মানবের ক্ষুদ্রশক্তিকে পূর্ণ ভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখে। যতই ক্ষণিক হউক সাগর মানবকে আত্মহারা করে, তাই সাগরবক্ষে তরঙ্গভঙ্গ মানবের এত প্রিয়। তরঙ্গ ভাল করিয়া লক্ষ্য কর—তরঙ্গ জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সৃষ্টি ও তরঙ্গ একরূপ। সৃষ্টিও ভগবৎ সাগরে এমনি করিয়া উঠিতেছে, এমনি করিয়া ভাঙ্গিতেছে। সৃষ্টিও ক্ষণ-ভঙ্গুর, তাই সাগর বড় আকর্ষণের বস্তু।

কিশোরী লহরীর সহিত খেলা করিতেছে। এখানে একটী বিচিত্র শঙ্খ, ওখানে কোন সুন্দর ফেনাকৃতি কঠিন পদার্থ, কোন স্থানে শত কোটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রিকজীবপূর্ণ শৈবাল। বালিকা বড় আগ্রহে এ সমস্ত একত্র করিতেছে, কখন বা ক্ষুদ্র কর্কটী ধরিতে ছুটিয়া যাইতেছে। আবার আগ্রহে পশ্চাতে দেখিতেছে, —যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছে। বালিকা কখন তীর হইতে কিছু দূরে আসিয়া শুষ্ক বালুকাস্তূপের মধ্য হইতে নানা বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শঙ্খ খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। মধ্যে মধ্যে খেলা ভুলিয়া সমুদ্র গর্জ্জনের লয় শুনিতেছে। লয় শুনিতে শুনিতে কখন অতলস্পর্শ নীলাম্বুরাশি অবলোকন করিতেছে। দূরে তরঙ্গভঙ্গ লক্ষ্য হয় না, আরও দূরে জলের উপরে মনে হয় আকাশের প্রাচীর, মনে হয় উহাই সমুদ্রের শেষ। দূর সাগর-বক্ষে লহরী উঠিল। জল রাশি উঠিতেছে পড়িতেছে, ক্রমে তীর-নিকটে আসিল—অল্পজলে লুণ্ঠিত হইবার স্থান মিলিল না—তরঙ্গ অতি উচ্চে উঠিয়া তীরনিকটে আছাড় খাইল, সফেন জলরাশি তীরের উপরে বহুদূর পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল। নিমেষ মধ্যে আবার ছুটিয়া গিয়া নীলাম্বু-ক্রোড়ে লুকাইল। বালিকা তন্ময়ী হইয়া সমুদ্র গর্জ্জনের বিরামকাল—ঐ সময়ের নিস্তব্ধতা অনুভব করিতেছে। চলিতে চলিতে কখন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে মনে নাই, আবার নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল—বালিকা শিহরিয়া পশ্চাৎ হটিতেছে; এই অবসরে হঠাৎ একটী তরঙ্গ-ভঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া নূপুরশোভিত সুন্দর চরণের অলক্তরেখা চুম্বন করিল।

সহসা বালিকা বলিয়া উঠিল "দুষ্টু"।

"কে দুষ্টু সত্যভামা?"

বিস্মিত হইয়া সত্যভামা দেখিল সম্মুখে এক মনোভিরাম পুরুষ। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নীলাম্বু হইতে নীল আকাশে চাঁদ উঠিল এবং পশ্চিমগগনে রক্তিমবর্ণ সূর্য্য জলে অদৃশ্য হইল।

"কে দুষ্টু সত্যভামা" ?

বিস্ময়ে সত্যভামা স্তম্ভিত। উপরে চাঁদ, নীচে চাঁদ। ক্ষণকালের জন্য সত্যভামা নির্ব্বাক, পরক্ষণেই বলিল "আর কে" ?

"সমুদ্র" ?

"না, দেখনা আমার পায়ের অলক্ত ভিজিয়া গিয়াছে"। 'দেখি' বলিয়া কৃষ্ণ চরণতলে উপবেশন করিতে চান, সত্যভামা সরিয়া দাঁড়াইল। সব সময়ে সত্যভামা পারিত না, যখন কৃষ্ণের কৌশলে পরাস্ত হইত তখন বলিত "যেন বা ভবতি সুখজাতং"। এ ক্ষেত্রে সত্যভামার জয় হইল।

পশ্চিম তীর হইতে কতকগুলি তরণী সমুদ্রতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। কৃষ্ণ সত্যভামাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইতেছেন—জলক্রীড়ার জন্য এই সমস্ত তরণী প্রস্তুত করিয়াছেন। বড় বড় নৌকার উপর নানা প্রকারের গৃহ। গৃহের বহির্দ্বার সকল বৈদূর্য্য, মরকত, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্তমণি দ্বারা বিচিত্র রূপে খচিত। বড় বড় পোত মধ্যে উদ্যান, সভা, দীর্ঘিকা এবং রথ। পক্ষিগণ সমুদ্রবক্ষস্থিত বনে সুমধুর স্বরে গান গাহিত। ময়ূরগণ পোতস্থ গৃহের উপরে বসিয়া কেকারব করিত। কোকিল কুহুধ্বনি করিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিত। সমুদ্র গর্জ্জনের বিরামকালে গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যখন এই কুহুরব দিগন্তে ছুটিত—তখন কি জানি ভিতরে কে যেন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত। মনে হয়, ঐ মাটীর দেহ যেন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

প্রাণের ব্যাকুলতা ইহাই প্রকাশ করিত। যানমধ্যে শত শত পুষ্পমালা, শত শত পুষ্পমালায় কত কত ভ্রমর গুঞ্জন করিত। সেখানকার বায়ু চন্দনরাগ ও পুষ্পরাগে সর্ব্বদা সুগন্ধীকৃত।

বহু তরণী নাচিতে নাচিতে সেই দিকে আসিতেছে। কৃষ্ণ ইহা দেখাইতেই সত্যভামাকে এই স্থানে আসিতে বলিয়াছিলেন। সত্যভামাকে একাকিনী দেখিয়া কৃষ্ণ অন্য কথা ভুলিয়াছিলেন, পোতাবলী দেখাইতে দেখাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ভদ্রা কোথায়?' সেই সময়ে দুর্গ মধ্যে তূর্য্যধ্বনি হইল। কৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া দুর্গের দিকে দেখিতেছেন। এক দূতি আসিয়া সত্যভামাকে কাণে কাণে কি সংবাদ দিল, সেই সময়ে এক তরণী নিকটে আসিল, কৃষ্ণ ইঙ্গিত করিলেন, নৌকা ফিরিল। ভদ্রা দূরে সত্যভামার অপেক্ষা করিতেছে—দূতি এই সংবাদ আনিয়াছে। কৃষ্ণ সত্যভামাকে ভদ্রার সহিত দুর্গে ফিরিতে বলিয়া দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইলেন। আমরা দ্বারাবতীর কথা বলিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

দ্বারাবতী ।

দ্বারাবতীর কৃষ্ণদত্ত নাম কুশস্থলী। ইহার আধুনিক নাম দ্বারকা। দ্বারাবতী প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত। তিন দিকে পশ্চিম সমুদ্র, সম্মুখে রৈবতক, মধ্যে এই নগর। রৈবতক প্রহরীর মত পুরীঅগ্রে দাঁড়াইয়া আছে।

সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, আকাশ ও মানব-হৃদয় প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তু। শ্রেষ্ঠ বস্তুর সহবাসে মানুষের নীচত্ব দূর হয়। যে দেশ সমুদ্র ও পর্ব্বত পরিবেষ্টিত সেই দেশ বড় সুন্দর। অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্দীপনা কার্য্যে সহায়তা করে।

এই সিকতাময় তাম্রমৃত্তিক অতি বিস্তীর্ণ প্রদেশ পুরাকালে সিন্ধুরাজার বিহারভূমি ছিল। এই রমণীয় নগর পূর্ব্বে অষ্ট-কোণ ছিল। কৃষ্ণ দুই দিকে নগরের দুই যোজন আয়তন বৃদ্ধি করেন!

মথুরায় কংস ধ্বংস হইল। কংস জরাসন্ধের জামাতা। সহদেবা ও অনুজা এই দুই বিধবা কন্যার 'গোহারীতে' জরাসন্ধ কৃষ্ণবিনাশে সঙ্কল্প করিল। এই জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করে। গিরিব্রজ জরাসন্ধের রাজধানী। এখনও রাজগিরিতে পুরাতন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

জরাসন্ধ নিরতিশয় দুর্দ্দান্ত। জরাসন্ধ ঐ কালের বহু রাজাকে পরাস্ত করিয়া গিরিব্রজে বন্দী করিয়া রাখে। ষড়শীতি ভূপতি এই ভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল, আর চতুর্দ্দশ জন হইলেই এক শত

রাজা বলিদান করিবে এবং রুদ্রপূজা সমাধা করিবে ইহাই জরাসন্ধের অভিপ্রায়। হংস ও ডিম্ভক জরাসন্ধের দুই প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি। ইহাদের প্রতাপে জরাসন্ধ কোন রাজাকে গণ্য করিত না।

ব্রহ্মার বরে জরাসন্ধ কৃষ্ণের অবধ্য। বহু দুষ্ট রাজা জরাসন্ধের সাহায্যে মথুরা আক্রমণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ এই উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ জন্য উগ্রসেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান যাদবগণকে মথুরাত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন, বলিলেন—"হে যাদবগণ! মথুরাপুরী অবশ্য মঙ্গলদায়িনী। আমরা এস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ব্রজে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, আমরা কংসাদি বহু শত্রু পরাজয় করিয়াছি, কিন্তু রাজমণ্ডলীতে বিশেষ জরাসন্ধের সহিত আমাদের বৈরীভাব বদ্ধমূল হইয়াছে। এ মথুরাপুরী অল্প পরিসর স্থান, শত্রুপক্ষীয়েরা অনায়াসে এ পুরী আক্রমণ করিতে পারে, অতএব আমার বোধ হয়, এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করাই বিধেয়। আমি অন্যত্র পুরী সংস্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছি"।

"আমাদের মঙ্গলের জন্য তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই কর" যাদবেরা এই উত্তর দিল। দিন স্থির হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে গোপালী অপ্সরা গর্ভে গার্গ্য মুনির ঔরসে জাত রাজা কালযবন জরাসন্ধের সহিত যোগ দিল। এই কালযবন শক, তুখার, দরদ, তঙ্গন, পারদ, খন, প্রভৃতি শত শত ম্লেচ্ছ জাতির সাহায্যে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল। সত্বরেই জরাসন্ধ ও কালযবন মথুরা আক্রমণ করিবে, কৃষ্ণ এই সংবাদ পাইলেন।

মথুরা আক্রমণের পূর্ব্বেই যাদবগণ মথুরা ত্যাগ করিলেন। সূর্য্য রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে যাদবগণ সিন্ধুরাজ

প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই রজনীতে সেই স্থানে স্কন্দাবার নিবেশন নির্দ্দিষ্ট হইল।

রজনী প্রভাতে কেশব জপ কার্য্য সমাপন করিয়া দুর্গনির্ম্মাণ-স্থান দর্শনার্থ বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রধান প্রধান যাদবগণ সঙ্গে চলিল। স্থান ঠিক হইয়া গেল। উৎকৃষ্ট দিনে, রোহিণী নক্ষত্রে, ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া মাধব দুর্গনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করাইলেন। দ্বারাবতী নগর অল্প দিনে বহু লোকজনে, বহু ধনে রত্নে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণের সুশাসনে দ্বারকার গৃহে গৃহে শান্তি স্থাপিত হইল। ষড়্‌বিধ দুর্গের মধ্যে এখানে দ্বারকাবাসী মনুষ্যদুর্গ, বারিদুর্গ ও গিরিদুর্গ আশ্রয় করিয়াছিল। দুর্গাশ্রিত হইয়া মহারাজ অধীনস্থ স্থান সমূহের জন্য এক এক মণ্ডলাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মণ্ডলাধ্যক্ষ, দশমণ্ডলাধ্যক্ষ, শতমণ্ডলাধ্যক্ষ দ্বারকায় নিযুক্ত ছিল। মণ্ডলাধ্যক্ষ নিজাধিকৃত মণ্ডলের দোষ পরিহার করিতেন। অসমর্থ হইলে দশমণ্ডলাধিপতির নিকটে নিজ দোষের কথা উত্থাপন করিতেন। এইরূপে দশ—শতের, শত—রাজার অধীন ছিল।

এখানে ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রচর্চ্চা, বৈশ্যের পশু পালন ও শূদ্রের দ্বিজাতি সেবাই প্রধান কার্য্য। চতুর্ব্বর্গের জীবিকা জন্য ব্রাহ্মণের যাজন ও প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যপালন, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য গো পোষণ, কুসিদ গ্রহণ, ধান্যাদি বীজ রক্ষা এবং শূদ্রের জন্য সেবা ও শিল্প কার্য্য নির্দ্ধারিত ছিল। আরও আভ্যন্তরীণ ব্যাপার পরিচালনা জন্য গুরু পরিবারমধ্যে জপ পূজা সংযমের বীজ বপন করিতেন, পিতা তাহাই নানা শাস্ত্র দ্বারা পরিস্ফুট করিতেন, মাতা নিয়মিত সময়ে তাহাই পুত্র কন্যাকে

অভ্যাস করাইতেন। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম অভ্যস্ত হইত, গৃহে গৃহে শাস্ত্র পাঠ হইত। শাস্ত্রমত কর্ম্ম অভ্যাস জন্য পিতামাতা আপনারা আচরণ করিয়া পরিবারবর্গকে আচরণ করাইতেন। পিতামাতা ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া—আপনারা সংযমী হইয়া—পরিবারমধ্যে সংযম শিক্ষা দিতেন। পিতা অর্থোপার্জ্জন করিতেন, মাতা গৃহলক্ষ্মী হইয়া তাহাই রক্ষা করিতেন। অযথা কিছুই ব্যয় হইত না। গৃহে গৃহে বহুদিনের খাদ্য সঞ্চিত থাকিত। প্রতি গৃহে দানের ব্যবস্থা ছিল। আপন আপন বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ দানের সুখ অনুভব করিতেন। গৃহে গৃহে যজ্ঞ হইত—দ্রব্যত্যাগের জন্য, ব্রত উপবাস হইত—ভোগত্যাগের জন্য, তপস্যা হইত—সুখত্যাগের জন্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ দ্বারকার অভ্যুদয়ের কারণ হইয়াছিল। পারিবারিক কর্ম্ম অভ্যাস জন্য পিতামাতা নিযুক্ত থাকিতেন, পরিবার সমস্ত পরিদর্শন জন্য গুরু ছিলেন। সমস্ত দ্বারকাবাসীর সদনুষ্ঠান জন্য, স্বধর্ম্ম পালন জন্য, কৃষ্ণ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। লোকে কাজ কর্ম্ম করিত ঈশ্বরপ্রীতি জন্য। ঈশ্বর-প্রীতি জন্য পরিবারমধ্যে সকলেই আপনাকে ভগবানের ভৃত্য মনে করিয়া অন্যের সেবা করিত। আপনার সুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সকলের সুখের জন্য প্রাণপণ করিত। সকলেই সকলের জন্য আত্মসুখ বলি দিত, কাজেই কাহারও কোন মনোদুঃখের কারণ ছিল না। হায়! আবার কবে শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথে জীব আপন কর্ত্তব্য শিক্ষা করিবে? যেমন ধর্ম্ম, অর্থ, কামে, দ্বারকার অভ্যুদয় হইল, সেইরূপ লোকে নিষ্কামভাবে আপন আপন বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া মোক্ষের জন্য প্রস্তুত হইত। এই চতুর্ব্বর্গ সাধনাই জীবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের

কারণ। ধর্ম্ম কর্ম্ম বিভ্রাট তথায় ছিল না; এইজন্ম দ্বারকা অল্পদিনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। গৃহে গৃহে আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ কন্যা বিরাজ করিত। দ্বারকাবাসী সকলেই স্বদেশ ভালবাসিত, দ্বারকার জন্য সকলেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত বলি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত।

দ্বারাবতী সতত প্রহরীগণে পরিরক্ষিত। বৃষ্ণিকুমারগণ সর্ব্বদা অতি যত্নে এই নগরী রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। নগরপ্রান্তে সমুদ্র। তাহার পরেই প্রথমতঃ শৈলময় প্রাচীর ও পরিখা দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। তৎপরে বিবিধ ধাতুমণ্ডিত পর্ব্বতদ্বারা সাতটী প্রাচীর প্রদত্ত হইয়াছে। নগরী এরূপ সুরক্ষিত যে অপরিচিত ব্যক্তিদিগের কোনরূপেই নগরে প্রবেশের উপায় নাই। কৃষ্ণ এইরূপে দুর্গ সংস্কার করিয়াছেন যে মহারথগণের কথা দূরে থাক্ স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। দূর হইতে দ্বারকা-পুরী কৈলাস শিখরাকার অট্টালিকায় পরিশোভিত দেখা যাইত।

চন্দ্র যেরূপ নক্ষত্রগণ শাসন করেন শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে দ্বারাবতী শাসন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণশাসিতা দ্বারাবতী দেখিতে দেখিতে অমরাবতীর ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করিল। সেখানে কেহই কাম-তৎপর, কদর্য্যস্বভাব, মূর্খ বা নাস্তিক ছিল না। স্ত্রী কি পুরুষ কেহই শ্রীহীন ছিল না। অসদাচারী, অপবিত্রান্নভোজী, অল্প-সঞ্চয়ী, প্রয়োজন সাধনে অসমর্থ এরূপ কোন ব্যক্তি দ্বারাবতীতে ছিল না। তথায় কোন ব্রাহ্মণ মূর্খ, অবেদাঙ্গবিৎ, অসত্যবাদী, ব্রতহীন, অশুদ্ধপ্রতিগ্রাহী ছিল না। চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে সকলেই দীর্ঘায়ু, দেবপূজক, অতিথিসেবা-নিরত, ধর্ম্মরত, এবং সত্যপরায়ণ ছিলেন। সেখানে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আজ্ঞাবহ, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের,

এবং শূদ্র ত্রিবর্ণসেবারূপ স্বধর্ম্মে রত থাকিত। লোকে আপন আপন স্বধর্ম্মে সন্তুষ্ট থাকিত, আপন আপন অবস্থায় পরিতুষ্ট থাকিত। হায়! আবার কবে ভারতে রাজ্যে রাজ্যে এইরূপ সুখ, এইরূপ শান্তি-বীজ স্থাপিত হইবে।

দুর্গ প্রস্তুত হইল। পর্ব্বতোপরি দুর্গ। রৈবতক দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে যোজনাধিক। এক বিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। এক এক যোজনের পর, শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণাবলী।

শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে দ্বারাবতী রাখিয়া রাজা মুচকুন্দ দ্বারা কাল-যবন বিনাশ করিয়াছিলেন।

যাদবগণ মহানন্দে সমুদ্র ও পর্ব্বত-পরিবেষ্ঠিত দ্বারাবতীতে বাস করিতে লাগিলেন।

বসুদেব পিতা, রোহিণী মাতা, সারণ সহোদর—সুভদ্রা পিতা-মাতার বড় আদরের। বিশেষ মাধব-ভগ্নী মাধবের অতি প্রিয়।

ভদ্রার বালিকাকাল মথুরায় অতিবাহিত। এই সমুদ্রবেষ্টিত পর্ব্বতসন্নিহিত পুরী পাইয়া ভদ্রার আহ্লাদের সীমা রহিল না। কৃষ্ণভগিনী প্রকৃতি বড়ই ভালবাসিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভদ্রা ও সত্যভামা।

"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ"। বিদ্যাপতি।

"ভদ্রা! বাঁদরি, এই গরম আর তুই এখানে?"

"আর তুমি ত এলে?"

"তিন মুল্লুক খুঁজে মলুম যে" এই বলিতে বলিতে সত্যভামা সুভদ্রার নিকটে আসিল।

বেলা দুই প্রহর। এই দেশ নাতিশীতোষ্ণ। কিন্তু এক এক দিন প্রকৃতি পাগল হইত। আজি বড় গরম। প্রখর রবি কিরণে প্রকৃতি নির্জ্জীব। গাছের পাতাটী অবধি নড়িতেছে না। সুভদ্রা বহুক্ষণ হইতে সত্যভামাকে খুঁজিল। পূর্ব্বরাত্রের তূর্য্যধ্বনি কেন হইয়াছিল জানিবার ইচ্ছা বড় বলবতী হইয়াছে। কৃষ্ণ দুর্গ বাহিরে থাকিলে এবং বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে বসুদেব আজ্ঞায় এই তূর্য্যধ্বনি হইত। প্রায়ই পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে সংবাদ আসিলে বসুদেব তূর্য্যধ্বনিতে কৃষ্ণকে আহ্বান করিতেন।

ভদ্রা কোন স্থানেই সত্যভামার তল্লাস পাইল না। না পাইয়া এই স্থানে আসিয়াছে। স্থানটী বড় নির্জ্জন, বিশেষ এ সময়ে ভদ্রা বড় একান্ত ভালবাসিত। চিত্ত বুঝুক আর না বুঝুক ঈশ্বরানুগত চিত্তের লক্ষণ একান্ত ভালবাসা এবং প্রকৃতি ভালবাসা।

সমুদ্রের অনতিদূরে সত্যভামার প্রাসাদ। প্রাসাদ হইতে সমুদ্রগর্জ্জন শুনা যাইত। এই প্রাসাদে সমুদ্রজলকণাসিক্ত বায়ু-তরঙ্গ সর্ব্বদা খেলা করিত। কৃষ্ণ সাধ করিয়া অভিমানিনীর জন্য

এই প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়াছেন। প্রাসাদের বেদী ও কুম্ভ সুবর্ণময়। তোরণ স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যমণিবিজড়িত। দ্বারদেশে সর্ব্বদা সুবর্ণকুম্ভ সজ্জিত থাকিত। মণি ও প্রবাল আস্তীর্ণ উপরিভাগে নিত্য নূতন পুষ্পমালা শোভা করিত। তোরণের শোভা ময়ূর-কণ্ঠের ন্যায় কর্ব্বুরবর্ণ। ভবন মধ্য হইতে নিরন্তর মধুর কণ্ঠস্বর উত্থিত হইত। যেন গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর অলক্ষিতে গৃহমধ্যে সুস্বরে গান গাহিত।

প্রাসাদের পশ্চিমদিকে একটী বড় রাস্তা। রাস্তা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বড় বড় মন্দির। মন্দির অতিক্রম করিলেই পথটীর দুই ধারে নিবিড় বৃক্ষরাজি। এক পার্শ্বের বৃক্ষশাখা অন্য পার্শ্বের বৃক্ষশাখায় বিজড়িত হইয়া পথটিকে কুঞ্জবন করিয়া রাখিয়াছে। দূরে কৃত্রিম ও নৈসর্গিক প্রাচীর।

তিনদিকে সমুদ্র এক দিকে পর্ব্বত। পর্ব্বত সমুদ্রের দিকে থাকিলেও দুর্গের ভিতর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিবার পথ ছিল। রৈবতক হইতে এক শাখা বাহির হইয়া এই স্থানে সমুদ্র জলে অবগাহন করিয়াছে। প্রায় চারিশত হস্ত জলের পর আবার পর্ব্বত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে পূর্ব্ব মুখে ছুটিয়াছে। পর্ব্বতের অপর-পারে অনন্ত নীলাম্বুরাশি। পূর্ব্ব-উত্তর দিক হইতে একটি ক্ষুদ্র নদী এই স্থানে সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে। ইহারই আর একটী শাখা সমুদ্রের সহিত মিশিতে না পারিয়া বালুকাস্তূপে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

ভদ্রা এই স্থানে আসিয়া বসিয়াছে। কৃষ্ণ এই স্থানটীকে বড় সুন্দর করিয়াছেন। স্থানে স্থানে জলক্রীড়ার জন্য গৃহ। বড় বড় প্রাচীর দিয়া জল বহু দূর পর্য্যন্ত ঘেরা। প্রাচীরের উপরে মণি মুক্তার জাল। অন্তঃপুরবাসিনীগণ এই স্থানে স্নান আহ্নিক

করিতেন। সমুদ্রমিশ্রিত নদীর জল এখানে লবণাক্ত ছিল না। সুভদ্রা যে স্থানে গিয়া উপবেশন করিয়াছে, সেটী সন্তরণ-ঘাট। সাগরের সহিত নদীর সঙ্গম স্থান।

সাগরের সহিত নদীর মিলন বড় সুন্দর। পর্ব্বত বক্ষে নদী লুক্কায়িত থাকে। পিতৃগৃহে কুমারী কন্যার ন্যায় কুল্ কুল্ করিয়া নদী যেন কত কথা কয়; আপন মনে কত খেলা করে। আবার যখন কালে নদীনাথ সমুদ্রের পিপাসা হৃদয়ে জাগরিত হয়, তখন যুবতী কন্যা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত মিশিবার জন্য ছুটিয়া যায়। পর্ব্বতবক্ষ বিদারণ করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারা গুলি আপন মনে ছুটিতে থাকে। প্রবল পিপাসায় এক টানা স্রোতে একমাত্র সাগর লক্ষ্য করিয়া শত বাধা পায়ে ঠেলিয়া নদী ছুটিতে থাকে! এ দৃশ্য বড় সুন্দর। পিতৃগৃহ হইতে বিদায় লইবার সময় কন্যা বড় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। হৃষীকেশে পর্ব্বতের নিম্নে গঙ্গার দৃশ্য ঠিক এইরূপ। কিন্তু পিতৃগৃহ হইতে কিছু দূরে আসিলে স্বামী চিন্তা কন্যাকে চঞ্চল করিয়া তুলে। হরিদ্বারে গঙ্গার বেগ অতি ভয়ানক। গঙ্গা উন্মাদিনীর মত চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গে কাহারও পানে লক্ষ্য না করিয়া দিবানিশি ছুটিতেছে। নদী যতই চলিতে থাকে, যত বাধা অতিক্রম করিয়া আইসে, যতই সাগরের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই আশা পুষ্ট হয়, ততই বল বৃদ্ধি পায়। মিলনের পূর্ব্বেই যেন মিলনসুখ এই স্থির ভাবিয়া মোহমগ্ন জনগণ মদমত্ত হইয়া অঙ্গ ভঙ্গী করিতে করিতে যেমন বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, নদীও সেইরূপ উভয় তটভূমিতে নিজ অঙ্গ হেলাইয়া দুলাইয়া সাগরাভিমুখে ধাইয়া চলে। আপনি নাচিয়া নাচিয়া সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে, যে কেহ নিকটে আইসে তাহাকেও নাচাইতে নাচাইতে সুখের সাগরে টানিয়া লয়। ভরা

প্রাণে তীরস্থিত বৃক্ষ লতা, নিকটস্থ জীবজন্তু সকলকে আপ্যায়িত করিতে করিতে, সকলকে তৃপ্তি দিতে দিতে নদী গন্তব্য স্থানে চলিতে থাকে। আনন্দভরা প্রাণে যাহার সঙ্গ হয়, সেই আনন্দ পায়। স্বভাবতঃ আনন্দ বিতরিত হয়; ইহাতে নদীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছু থাকে না। এক প্রবল ইচ্ছায় শতকোটী ইচ্ছা লয় হইয়া যায়।

এত যে কুল্ কুল্ করিয়া ছুটিয়া আইসে, এত যে পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আইসে, একবার কিন্তু সাগরস্পর্শে আর সে উন্মত্তগতি থাকে না, আর সে তরঙ্গভঙ্গ থাকে না, আর সে কুল্ কুল্ ধ্বনি থাকে না—নদীনাথের অঙ্গস্পর্শে সব শিথিল হইয়া যায়। প্রণয়িনী যেন কি এক ঘুমঘোরে ঘুমাইয়া পড়ে। আবার যখন চেতন হয়, যখন আপনার বুকভরা সুখ আপনি দেখে তখন মনে হয়, পিতৃগৃহে একবার দেখাইব না আমার কত সুখ। স্বামীর আদর মাখিয়া নদী উৎপত্তিস্থানের দিকে ছুটিয়া যায়। প্রবল-বেগে কতক দূর যাইতে যাইতে আর যাইতে পারে না। 'এতক্ষণ কি ছাড়িয়া থাকা যায়'? নদী আবার সাগরাভিমুখে ছুটিয়া আইসে। এ খেলা নিত্য হয়, লোকে বলে জোয়ার ভাটা হয়।

বাহিরের নদীতে যাহা হয় ভিতরের চিত্ত নামক নদীতেও সেইরূপ কিছু একটা হয়। ব্রহ্মসাগরে সমাধিমগ্ন হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াও চিত্ত আবার জীবে দয়া করিতে সংসারে আইসে। কিন্তু "এতক্ষণ কি ছাড়িয়া থাকা যায়" কতক দূর আসিয়া আবার সমাধিসাগরে মগ্ন হইতে ছুটিয়া যায়।

বিজ্ঞান যুক্তি দিয়া ভাব উড়াইয়া দেয়। কিন্তু নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত ইহারা কামরূপী। ইহাদের দুইটী করিয়া শরীর। একটী জড় স্থূল দেহ, অন্যটী চেতন দেহ। কখন জড়ের সহিত মিশিয়া জড়

প্রায় থাকে, কখন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া খেলা করে। এই জন্ত হিন্দুশাস্ত্রে হিমালয়ের কন্তা পার্ব্বতী, গঙ্গা মহাদেবের স্ত্রী, সূর্য্যের স্ত্রী ছায়া, সমুদ্রের দেবতা বরুণ, আরও কত আছে। জড় বিজ্ঞানে এই সবে চৈতন্তে দৃষ্টি পড়িতেছে। কালে আরও পড়িতে পারে।

ভদ্রা এই স্থানে উপবেশন করিয়া কখন সাগর, কখন নদী, কখন উভয়ের মধুর মিলন ভাবিতেছিল। আর একটু দূরে ঐ নদীর একটী শাখা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত আসিয়া আর যাইতে পারিতেছে না। সমুদ্রতীরে রাশিকৃত বালুকা। ঐ বালুকাস্তূপ অতিক্রম করিলেই নদী সমুদ্রে গিয়া মিশিত। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ নদী শুনিতেছে, কিন্তু বালুকারাশি অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই। ভদ্রা কত কি চিন্তা করিতেছে। ভাবিতেছে যদি কোলে করিয়া নদীকে সমুদ্রের উপরে দিয়া আসিতে পারিত! অকস্মাৎ কৃষ্ণের কথা মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সত্যভামা। এই সত্যভামাকে ভদ্রা অত্যন্ত ভালবাসিত, আর ভাবিত এত অভিমান করে কেন? ভদ্রা এখনও বালিকা।

দ্বারাবতী আগমনের অল্প দিন পরেই সত্যভামার সহিত ভদ্রার পরিচয়। মাধব ভগিনীকে বড়ই ভালবাসিতেন, তাই ভদ্রার সহিত সত্যভামার সখিত্ব। ভদ্রা বালিকাকালে মথুরায় প্রতিপালিতা। বসুদেব ও রোহিণী ভদ্রাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন। কৃষ্ণ যত্ন করিয়া ভদ্রা-পুষ্প ফুটাইবার জন্ত শিক্ষা দিতেন।

অতি বালিকাকালে ভদ্রা পাঁচ সাত কুমারী সঙ্গে খেলা করিত। মাটীর ঠাকুর গড়িয়া তাহার পূজা করিত। উদ্যান হইতে রাশিকৃত ফুল তুলিয়া আনিত। রোহিণী মালা গাঁথিয়া দিতেন, সে মালা ভদ্রার মনোনীত হইত না। মার গ্রথিত

মালা সুন্দর হইলেও ভদ্রা ঠাকুরকে উহা পরাইতে পারিত না। বালিকা ক্ষুদ্র হস্তে ছোট ছোট ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে বসিত। বড় বড় কুঞ্চিত কেশ লইয়া পবন ক্ষুদ্র মুখকমল যখন ক্ষণতরে আচ্ছাদন করিত আর বালিকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দিয়া যখন তাহা সরাইত, তখন বড় সুন্দর দেখাইত। মনে হইত যেন কোন জীবন্ত প্রতিমা চিত্রপটে আঁকা রহিয়াছে। ফুল ঠিক করিয়া সাজাইয়া গাঁথিতে জানে না, তথাপি যেমন তেমন করিয়া গাঁথিত। খেলার ঠাকুরের গলায় স্বহস্তে খেলার মালা দিয়া ভদ্রা সঙ্গিনীদের ডাকিত, বলিত দেখদেখি কত সুন্দর সাজিল। কখন আপনি হাসিত, কখন গম্ভীর হইয়া বলিত "ঠাকুর কেন আমার দিকে চাহিয়া হাসে বলিতে পারিস" বালিকার খেলাও সাত্ত্বিক।

ভাই ভগিনীর লীলা প্রায়ই একরূপ। এই সুভদ্রাই অভিমন্যুর জননী। সুভদ্রাই দণ্ডীরাজাকে আশ্রয় দিয়াছিল। দণ্ডীরাজাকে আশ্রয় দিলে যদি কৃষ্ণের সহিত বিরোধ হয় সুভদ্রা তাহাতেও প্রস্তুত হইয়াছিল। সুভদ্রা ক্ষত্রিয়াণী। কিন্তু জীবনের প্রাতঃকালে সুভদ্রা রঙ্গময়ী—ভদ্রা প্রেমময়ী।

প্রাতঃকালে ভদ্রা সখী সঙ্গে ধূলার হাঁড়ি ধূলার কাঠ ধূলার আগুনে ধূলার অন্নব্যঞ্জন রাঁধিত। মিথ্যার অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া ধূলার ঠাকুরের ভোগ দিত। মিছামিছি প্রসাদ খাইত। আমরা শুনিয়াছি ধূলাও মিষ্ট লাগিত ঠাকুরকে নিবেদন করা হইয়াছে বলিয়া। আশ্চর্য্য প্রহেলিকা! শেষে ধূলার সংসার ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়াও এত মিষ্ট লাগিয়া যায়, এত সত্য বোধ হইয়া যায় যে মনে হয় ইহার প্রতি ধূলিকণা জীবন্ত সত্য। ঠাকুর দেবতা মিথ্যা—কাল্পনিক।

বালিকা কালে ভদ্রা প্রাতঃকালকেই সন্ধ্যা করিত। মিছা-

মিছি সন্ধ্যা হইয়াছে বলিয়া মিথ্যার পঞ্চপ্রদীপ লইয়া আরতি করিত, শীতল দিত, পরে ঠাকুরকে শোয়াইয়া সখীদিগকে শয়ন করিতে বলিত। শেষে আপনি আঁচল পাতিয়া ঠাকুরের পদতলে ধূলায় শয়ন করিত। ভদ্রা সঙ্গিনীদিগকে চক্ষু বুজিতে বলিত। সকলে তাহাই করিত। ভদ্রা তখন ঠাকুরের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া থাকিত, কি ভাবিয়া কখন কাঁদিত কখন হাসিত বলা যায় না। বালিকা ঠিক বালিকাই নহে। কত জন্মের প্রবল সাধ হৃদয়মধ্যে থাকিয়া যায়, প্রথম হইতেই তাহার অভিনয় হইতে থাকে। সুভদ্রা হঠাৎ আপন মুখে "কা" "কা" করিয়া উঠিত। সঙ্গিনীদিগকে বলিত ভাই 'ওট্' 'ওট্' ভোর হইয়াছে। কাক ডাকিতেছে। বালিকাকালে ভদ্রা "দিনে রাত" "রাতে দিন" করিত।

এইরূপে কতক দিন কাটিয়া গেল। শশিকলার ন্যায় ভদ্রা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে পূজা ও স্তবাদি শিখিল। পূজা অন্তে সখী সঙ্গে সমস্বরে যখন স্তব পাঠ করিত, তখন বড় সুন্দর শুনাইত।

কখন পাঠ করিত প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথ নাথং সদানন্দ ভাজং।

কখন বলিত—মৌলৌ চন্দ্রদলং গলে চ গরলং জূটে চ গঙ্গাজলং।

কখনবলিত—ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচ পচ সহসা ঝম্য ঝমং প্রঝম্যং।

কখন অতি মধুর স্বরে গাহিত 'অরুণাধররঞ্জিতবিম্বাং জগদম্বাং গমনবিজিতকাদম্বাং।" ভদ্রা সমস্ত স্তব কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। সমস্ত দেবতাকে পূজা করিত। মূর্ত্তি বহু, দেবতা এক। ভদ্রা এই শিক্ষা পাইয়াছিল। বহু একেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; ভদ্রা ইহা

ধারণা করিয়াছিল। কোন দেবতার উপর ভদ্রার বিদ্বেষ ছিল না, তথাপি ভদ্রা নারায়ণকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

বালিকা একাকিনী যখন ক্ষুদ্র কণ্ঠ কাঁপাইয়া ক্ষুদ্র বিহঙ্গিনীর মত গাহিত—যখন প্রার্থনা করিত—

তবচরণসরোজে মন্মনশ্চঞ্চরীটো
ভ্রমতু সতত মীন প্রেমভক্ত্যা সরোজে।
জনন মরণ রোগাৎ দেহি শান্ত্যৌষধাজ্ঞে
সুদৃঢ় সুপরিপক্কাং দেহি ভক্তিঞ্চ দাস্যম্॥

'নারায়ণ! আমার মানসভৃঙ্গ সর্ব্বদা প্রেম ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া তোমার চরণসরোজে বিচরণ করুক, তুমি কৃপা করিয়া সুদৃঢ় ভক্তি প্রদান করিয়া শান্তিরূপ ঔষধ দানে আমাকে জনন মরণ রোগ হইতে পরিত্রাণ কর।' ভদ্রা বালিকা। ভদ্রা অর্থ বুঝিত না, কিন্তু যাহারা এই প্রার্থনা শুনিত :তাহারাই মুগ্ধ হইয়া যাইত। এমন কি ভদ্রা স্তব পাঠে আপন গুরু শ্রীকৃষ্ণকেও চঞ্চল করিত।

ভদ্রার বালিকাকাল অতিক্রম হইতে চলিল। এই বয়সেই ইহার প্রাণে দয়ার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু যেমন স্বচ্ছ ক্ষুদ্র হৃদয়ে অনন্ত আকাশের ছায়া ধরিয়া সুন্দর দেখায়, এই কচিপ্রাণে জীবে দয়া সেইরূপ দেখাইত। আমরা ভদ্রার আরও শিশুকালের কথা শুনিয়াছি। প্রভাতে অরুণালোকে যখন পাখী প্রথম শব্দ করিত ভদ্রা তাহাই শুনিতে গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিত। ভদ্রা বালিকা কিন্তু ঠিক বালিকার মত কথা কহিত না। বলিত—এইত আমি আছি তবুও এত ডাকাডাকি কেন? কখন আয় আয় বলিতে বলিতে পাখীর জন্য খাদ্য ছড়াইত; কত টীয়া, কত ময়ূর, ভদ্রার কাছে কাছে ঘুরিয়া

বেড়াইত। কখন মুনিকন্যাদের মত আলবালে জলসেচন করিত। কত বনবিহঙ্গ জলপানার্থ আগমন করিত—তাই দেখিয়া ভদ্রার আনন্দের সীমা থাকিত না।

দীন দরিদ্র পাইলে ভদ্রা যত্ন করিয়া বাড়ীতে আনিত। ভদ্রা রাজার মেয়ে, ভিখারীকে বহু ধন রত্ন দিয়া পরিতোষ করিত, তাহাদের আনন্দাশ্রু দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রাও কাঁদিত।

কখন ভদ্রা কোন পুতুলকে বীরবেশে সাজাইত। তাহার পাশে একটী ছোট পুতলী আনিয়া বিবাহ দিত। পিতা বলিতেন "এই বরে তোর মেয়ে দিবি", ভদ্রা দৌড়িয়া গিয়া মায়ের আঁচলে মুখ লুকাইত।

মথুরায় থাকিতে থাকিতে ভদ্রা নৃত্যগীত শিক্ষা করিয়াছিল, অকাল জলদাগমে ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া ভদ্রা আপনি নাচিত। কখন হরিণ হরিণীর সঙ্গে ছুটিত। কৃষ্ণ ভদ্রার জন্য এক কৃত্রিম পাহাড় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেখানে বহু হরিণ হরিণী থাকিত। ভদ্রা ইহাদের সহিত খেলা করিতে ভালবাসিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যাদবগণ জরাসন্ধের উৎপীড়নে মথুরা ত্যাগ করিয়াছে, দ্বারাবতী আসিয়াছে, সকলের সঙ্গে ভদ্রাও আসিয়াছে।

এখানে প্রকৃতি বড় মনোহর। পর্ব্বত ও সমুদ্র দেখিয়া ভদ্রার আশা মিটিত না। পূর্ব্বে যে নদীর কথা বলিয়াছি ভদ্রা কত দিন সেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিত। সুদূর কাননশিরে সূর্য্যাস্তকালে যখন পাখীর ঝাঁক চঞ্চল মালার মত এক একবার কাননশির স্পর্শ করিত আবার আকাশের গায়ে উৎপতিত হইত, যখন উর্দ্ধে অনন্তবিস্তৃত আকাশবক্ষ, নীচে

বহুদূর প্রসারিত কাননশীর্ষ, এই বিহঙ্গশ্রেণীগ্রথিত বহু আকার-বিশিষ্ট জীবন্ত পুষ্পমালা দ্বারা সুসজ্জিত হইত, ভদ্রা তখন তন্ময়ী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কাহাকেও দেখাইতে চাহিত কি না বলা যায় না। আবার সন্ধ্যা আসিতে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইত। ক্রমে একটী সঙ্গিনী জুটিল, এই সখীর নাম সত্যভামা।

সত্যভামা ভদ্রাকে বড় ভালবাসিত। কৃষ্ণ ও সত্যভামা স্পর্শে এই ভদ্রা-পুষ্প সুন্দর ফুটিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে "শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল, নয়নক পথ দুঁহু লোচন নেল" ঠিক করিয়া বলা যায় না ভদ্রা এখন বালিকা কি যুবতী।

দুরন্ত শীতে প্রকৃতি জড়সড়। হঠাৎ একদিন মলয় বহিল, নদী তড়াগের জল নির্ম্মল হইল, পাখীর স্বর সুমিষ্ট হইল, শীতের মধ্যে বসন্ত দেখা দিল। একদিনের জন্য বসন্ত আসিল, এক-দিনেই ফুরাইল, আবার বিপরীত শীত পড়িল। যাহা পরে আসিবে, পূর্ব্ব হইতে মধ্যে মধ্যে তাহা এক একবার দেখা দিয়া যায়।

জীবনের বয়ঃসন্ধি বড় সুন্দর। কৈশোর এখনও ফুরায় নাই, যৌবন এখনও আইসে নাই, এই অবস্থায় বালিকাহৃদয়া-কাশে শতভাবের খেলা হয়। নিশিশেষ ও প্রভাতের মধ্যে অরুণোদয়ের মত বালিকাহৃদয়াকাশে এই শত রঙ্গের মেঘের খেলা বড় সুন্দর।

ভদ্রা এখনও আপন মনে খেলা করে, খেলিতে খেলিতে খেলে না। লোক দেখিলে ছুটিয়া পলায়। নির্ব্বাক হইয়া মিছামিছি কি দেখে, আবার দেখিতে দেখিতে দেখে না।

ভালবাসার কথা শুনিতে যেন নিতান্ত অনিচ্ছা, কিন্তু সত্যভামার সঙ্গ ছাড়ে না। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে একবারে উত্তর দিতে পারে না। সুন্দর অধরপ্রান্তে বিদ্যুতের মত সুন্দর হাসি দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যায়। সহচরী সঙ্গে পথে চলিতে চলিতে খেলা করে। কখন চঞ্চল, কখন স্থির। কখন কৌতুক করে, কখন গম্ভীর হয়। চাঁদ মাজা মুখরুচি বড় সুন্দর,—সুন্দর মুখে সুন্দর অধর, যেন কমলের সহিত বান্ধুলি জড়াইয়া থাকে। বড় বড় ইন্দীবরশ্যাম নয়ন যুগল, আঁখিতারা থির। কবি বলেন

"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।"

ভদ্রার কথা কহিবার ভঙ্গী—এ ভঙ্গী বড় মনোহর। এক জনকে ডাকিয়া অন্যের সঙ্গে পরিহাস করে। সত্যভামা যখন কৃষ্ণের নিকটে থাকেন ভদ্রা সত্যভামাকে স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিতে পারে না, কিন্তু গোপনে দাঁড়াইয়া কি এক সুন্দরভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, কৃষ্ণকে লুকাইয়া, সত্যভামার সহিত কথা কয়। কৃষ্ণ সত্যভামা-দর্পণে ভদ্রার ছায়া দেখিয়া সত্যভামার সহিত ভদ্রা সম্বন্ধে কত কথা কহেন। বাক্যালাপকালে ভদ্রার আঁখিযুগলে অলক্ষ্যে শত সাধ ফুটিয়া উঠে, সংরুদ্ধ আনন যেন কত কথা কহিয়া যায়। কতবার ভদ্রা দর্পণে নির্জ্জনে আপন রূপ দেখিয়া আপনি হাসে। ভদ্রার বাক্যালাপ কখন ভাবে আধ আধ হইয়া যাইত, কখন বনবিহঙ্গিনীর পরিষ্কার কণ্ঠস্বরের মত প্রস্ফুট হইত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আজ বড় গ্রীষ্ম। ভদ্রা একাকিনী এই স্থানে আসিয়া বসিয়াছে, কত কি ভাবিতেছে। বালিকার ভাবনা বালিকার মত। ভদ্রা ভাবিতেছে, আর সত্যভামার কাছেও

বষা না, কথাও কব না। এমন সময়ে কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল—"ভদ্রা!"

সত্যভামার আদর সম্বোধনে ভদ্রা সঙ্কল্প ভুলিল, অভিমান এখনও পাকা হয় নাই। অসাবধানে ভদ্রার মুখ হইতে একটু অভিমানের কথাই বাহির হইল "তুমি ত এলে" বলিয়াই ভদ্রা একটু কপটতা জাগাইল। এ কপটতা স্বাভাবিক! এ যেন ভালবাসার ধর্ম্ম। সত্যভামা তাহাকে অনেক খুঁজিয়াছেন জানাইলেন, কিন্তু ভদ্রা যেন কিছু শুনিয়াও শোনে না। সত্যভামা আসিলেন আর ভদ্রা কিছু না বলিয়া জলে নামিল।

সত্যভামা। ভদ্রা, জলে নামিস্ কেন? ওঠ্।

ভদ্রা আরও দূর জলে।

সত্যভামা। ভদ্রা, একটা ভাল কথা আছে—

ভদ্রা ঈষৎ হাসিয়া পেছনে হটিতেছে। সত্যভামার দিকে চাহিয়াও চাহিতেছে না। ভদ্রা আকণ্ঠ জলে। সত্যভামা একটু ভয় পাইয়াছেন ভদ্রা ত সাঁতার জানে না। সত্যভামা জলে নামিলেন। একটু ব্যস্ত ও হইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে ভদ্রা আরও দূর জলে, বিস্ময়ে সত্যভামা দেখিতেছেন ভদ্রা সাঁতার দিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসিতেছেন "কবে শিখ্‌লি"?

এখনও ভদ্রা সাঁতার দিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ আলুলায়িত কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে মুখের উপর পড়িতেছে। চম্পক অঙ্গুলীতে তাহাই সরাইতে সরাইতে ভদ্রা উত্তর করিল "যেদিন শুনিলাম তুমি জান সেই দিনই"।

"আচ্ছা উঠে আয় বড় ভাল খবর; তুই যা চাস তাই"।

"তুমি আগে একবার সাঁতার কাট তারপর" সত্যভামা দূর

জলে আসিলেন। দুইটী পদ্ম শ্যামসলিলে বড় সুন্দর দেখাইল। একটী বিকশিত হইতেছে, অন্যটী বিকাশোন্মুখ। সত্যভামা ভদ্রার নিকটে।

ভদ্রা বলিল—সখি! ডুবিয়া মরি?

সত্যভামা বলিলেন, কেন, কোন্ দুঃখে?

"পাইনা যে" বলিয়াই ভদ্রা ডুবিল। সত্যভামার মনে হইতে লাগিল ভদ্রা অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া আছে। সত্যভামা কাতর হইয়া তীরের দিকে ফিরিতে চান ভদ্রা উঠিল। সত্যভামা বলিলেন ভদ্রা, রঙ্গ রাখ, এখনই খুঁজিতে লোক আসিবে।

ভদ্রা। সে তোমায়।

সত্যভামা। আর তোকে কেউ খোঁজে না ভদ্রা?

ভদ্রা এবার কথা শুনিল, তীরে উঠিয়া বলিল, দেখ আমার এখনও রাগ যায় নাই, খুব ঝগড়া করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হাসিয়া সত্যভামা বলিলেন—"কর গো"।

ভদ্রাও হাসিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—মনে ত করিয়াছিলাম করিব কিন্তু পারি কৈ? ঐ মুখে ঐ হাসি—এতে কি ঝগড়া হয়, ঝগড়া করিতে গিয়া আদর হইয়া যায়।

"তবুও দেখ্" সত্যভামা হাসিতেছেন। কৃষ্ণভগিনী,—কি জানি কতখানি প্রাণ ইহার আছে; ভদ্রা একবার কাতর চক্ষে সত্যভামার দিকে চাহিল, কি ভাবিল, কিছুই উত্তর করিল না। সহসা সত্যভামা বলিলেন "ভদ্রা! একটা কথা বলিব ঠিক বলিবি?"

ভদ্রা। আর যদি না বলি—

সত্যভামা। বলিতেই হইবে

ভদ্রা। ইস্ ভারি ত জোর

সত্যভামা। তা কি নয় ভদ্রা?

ভদ্রা এবারে "ভিতরে গলিয়া গেল,—বলিল,—"আগে বল তোমার কি ভাল খবর?

ভদ্রা ও সত্যভামা বস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন। ভদ্রা আপন গৈরিক বাসের উপর সত্যভামার নীল শাটী জড়াইতেছে। এমন সময়ে এক দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—ঠাকুর ডাকিতেছেন, তোমরা জলে পড়িয়াছিলে বলিগে।

ভদ্রা। দেখ্ বলিস্‌নি আমরা যাইতেছি। দাসী চলিয়া গেল, ভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল 'সখি! দাদা কি রৈবতকে যাইবেন'?

সত্যভামা ঐ সংবাদ দিতেই আসিয়াছিলেন। রৈবতকে মহোৎসব হইবে। সব প্রস্তুত হইতেছে, তিনি বলিয়াছেন বহুদিন ধরিয়া এই উৎসব চলিবে। রৈবতক সুন্দর সজ্জিত হইবে।

ভদ্রা। আর কালিকার তুর্য্যধ্বনি? পাণ্ডবদিগের কি কোন সংবাদ আছে?

সত্যভামা। তাতে তোর কি প্রয়োজন?

ভদ্রা। পাণ্ডবদিগকে দাদা যে বড় ভালবাসেন, দাদা কি আর কোথাও যাইবেন?

সত্যভামা একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, যাইবেন কোথাও, এখনও জানি নাই।

ভদ্রা একটু অন্যমনস্ক হইল। পরক্ষণেই একটু হাসিল। তখন উভয়ে দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ সত্যভামার অপেক্ষা করিতেছিলেন। শিশির স্নাত

গোলাপ দেখিয়া কি বলিতে গিয়া কি বলা হইয়া গেল, অথবা কৃষ্ণ ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ করিলেন। কৃষ্ণ সত্যভামাকে কি জানাইলেন, জানাইয়াই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বাহিরে দেখিলেন "ভদ্রা"। ভদ্রা একটা প্রণাম করিল। শ্রীকৃষ্ণ আশীর্ব্বাদ করিলেন বলিলেন "ভদ্রা, তোমার জন্যই রৈবতকে যাইতেছি।"

কৃষ্ণ চলিয়া গেলে ভদ্রা টিপ্ করিয়া সত্যভামাকে আর একটা প্রণাম করিল। "তোর জন্যই রৈবতকে উৎসব" বলিতে বলিতে সত্যভামা ভদ্রার হাত ধরিয়া তুলিলেন, তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন 'ভদ্রা, কে না তোরে ভালবাসে?'

ভদ্রা একটী 'হুঁ' করিয়া ক্ষণিক চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল "আমার জন্যই উৎসব" দাদা যখন যার কাছে তখন তারই।

ভাল তুমি জলে যে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে তাত এই ভালবাসা। দাদা কারে বেশী ভালবাসেন? ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা, এ ছাড়া তোমার আর কথা নাই। তুমিই আদরের আদরিণী। তোমা ছাড়া কে আর দাদার প্রিয় হইতে পারে? পারিজাত হরণ ভাবিয়া দেখ না। কিন্তু আজ ত দাদার কাছে বড় ভদ্র হইয়া কথা কহিতেছিলে—কেন, আমি ছিলাম বলিয়া বুঝি?

সত্যভামা ভদ্রার চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন। ভদ্রা সত্যভামার বক্ষে মস্তক রাখিয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিল পর মুহূর্ত্তেই সরিয়া আসিল।

দুইটী গোলাপ গাছে এক রকমের দুইটী ফুটন্ত গোলাপ বায়ুভরে মিলিত হইবার পরক্ষণেই বৃক্ষ দুইটী আবার আপন

আপন স্থানে দাঁড়াইলে যেমন দেখায় এ আদরও সেইরূপ দেখাইল।

সত্যভামা। ভদ্রা! তোরে গোপালিকার বেশে সাজাইয়া লইয়া যাইব, কেমন?

ভদ্রা। যেমন তোমার ইচ্ছা।

সত্যভামা। আর—

ভদ্রা। আর কি?

সত্যভামা। আমার একটী সখী আছে তার—

ভদ্রা। তার নাম শ্রীমতী সুভদ্রা মহারাণী—

সত্যভামা একটু রঙ্গ করিলেন—বলিলেন তার নাম শ্রীমতী দ্রৌপদী রাজ্যেশ্বরী কেমন?

ভদ্রা একটু কেমন কেমন হইয়া গেল। ভদ্রা সময়ে সময়ে বৃন্দাবনের কথা পাড়িয়া রঙ্গ করিত। সত্যভামা একটু পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিতে তোর বড় ভাল লাগে তাই বলিতে যাইতেছিলাম। একা অর্জ্জুন এক লক্ষ নরপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এমন বীর আর জগতে কে আছে?

ভদ্রা। কে আছে তা কি তুমি জাননা সখি? এই আকাশ কত সুন্দর। নিত্য দেখি সৌন্দর্য্য ত ফুরায় না, পুরাতন ত হয় না, মনে হয় বুঝি দেখিয়া শেষ করা যায় না। ভদ্রা তখন স্যমন্তক মণির জন্য অদ্ভুত যুদ্ধের কথা কহিল। কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে ভদ্রা অভিভূত হইয়া যাইত। বলিতে আরম্ভ করিলে ভদ্রাকে নিরস্ত করা যাইত না। সত্যভামা এতটা বিহ্বল ভাব দেখিয়া কত কি অনুভব করিতেন। এক বস্তুতে দুইটা 'আমার' স্থাপিত হইলে কি কিছু হয়? স[illegible]মার

সমস্ত আয়োজনের মূলে কি কিছু ছিল? ভদ্রা ত কিছুই লক্ষ্য করে নাই। ভদ্রা—কুবলয়-পীড়নের কথা কহিল। শেষে কংস বধ। ভদ্রা ক্ষত্রিয় কন্যা—উত্তেজিত হইয়া ভদ্রা বলিতেছে—'সখি! এ বীরত্বের নিকট আর কার বীরত্ব? একবার স্মরণ করিয়া দেখ দেখি যখন কংসের তর্জ্জন গর্জ্জনে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, দৈত্যগর্ব্ববিনাশক স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিবামাত্র চক্র হস্তে আসিয়া ঝলসিয়া উঠিল, কংসের দোষ উল্লেখ করিতে করিতে কেশীসূদন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; একপদ অগ্রে একপদ পশ্চাতে, আর সর্ব্বসংহারকারী চক্র অঙ্গুলী উপরে ঘুরিতেছে। কংস কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিয়া ধাবমান হইতেছে। সভাস্থল নিস্তব্ধ। কংস উর্দ্ধে অসি উত্তোলন করিয়াছে আর এক মুহূর্ত্ত মধ্যে তরবারি পতিত হইবে, এই সময় সুদর্শন পরিত্যক্ত হইল। সহস্র সহস্র সভাসদ সমক্ষে কংসের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। এ বীরত্বের তুলনা কি জগতে আছে? আর এই ভুবনমোহন রূপ! এই শৌর্য্য! কত সুন্দর!

সত্যভামা মনে মনে কত কি ভাবিলেন। মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন 'তথাপি আজ জগতে পাণ্ডবসখা বলিয়াই পরিচিত।'

ভদ্রা। ইহাতেও অভিমান?

সত্যভামা। না, ভদ্রা, বল্ দেখি জগতে কার সৌভাগ্য বেশী?

ভদ্রা। কেন তোমার। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক মধুসূদন যে অভিমানের কাছে পরাস্ত হইয়া যাঁহার চরণ গ্রহণ করেন তাঁহার কাছে আর কার সৌভাগ্য?

সত্যভামা। তুই কি বুঝিবি ভদ্রা। অর্জ্জুনের সৌভাগ্য
। জগতে সৌভাগ্য আর কাহারও নাই। দেখ্ আজ—

সত্যভামা সহসা অন্য কথা পাড়িলেন। তখন পাণ্ডব-প্রসঙ্গ উঠিল। কৃষ্ণ, উদ্ধব ও অর্জ্জুন যে দেখিতে একরূপ সত্যভামা ভদ্রাকে অনেকবার বলিয়াছেন, এখন আবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের রূপ, অর্জ্জুনের গুণ সত্যভামা বর্ণনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল—সত্যভামা ইহা ভাল করিয়া বুঝাইলেন। শেষে বলিলেন যদি অর্জ্জুন রৈবতকে আসে ?

ভদ্রা বলিলেন—দাদার মত দেখিতে ?

সত্যভামা। ঠিক ঐরূপ, যদি আসে ?

ভদ্রা। দুই দাদাকে টিপ্ টিপ্ করিয়া দুইটা প্রণাম করি, আর কি ?

ভদ্রা সত্যভামার কি অভিপ্রায় বুঝিতে পারে নাই। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণরূপ ভিন্ন ভদ্রার হৃদয়ে আর কিছুই নাই। কিছুই থাকিতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত বলিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়, কৃষ্ণসখা বলিয়া ভদ্রা অর্জ্জুনপ্রসঙ্গ শুনিতে চায়।

সত্যভামা পুনঃ পুনঃ পাণ্ডবদিগের কথা উত্থাপন করিলেন। শেষে অর্জ্জুনের দ্বাদশ বৎসর বনবাসের কথা উঠিল।

ভদ্রা বড় আগ্রহে অর্জ্জুনের তীর্থভ্রমণের কথা শুনিতে চাহিল। ভদ্রা তীর্থ বড় ভালবাসিত।

সত্যভামা বলিলেন যদি অর্জ্জুন আসে তখন শুনিস্। আমরা কিন্তু যদুবংশে স্বয়ম্বর দেখিব।

"যাও" বলিয়া ভদ্রা ছুটিয়া পলাইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণ।

রৈবতকে প্রভাত হইতেছে। পর্ব্বতোপরি প্রাসাদ। প্রাসাদের উপরে এক মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। মহাপুরুষ কৃপণ মানবের মত রজনীসম্মার্জ্জনী হস্তে অনন্ত আকাশ গৃহ ঝাঁট দিয়া সুমেরু পার্শ্ব হইতে সূর্য্যালোকরূপ সুবর্ণ খণ্ড এই মাত্র সংগ্রহ করিয়া এইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী এই মহাপুরুষ সূর্য্যপ্রদীপে আলোকবর্ত্তিকা দিয়া জগৎগৃহকোণে কোথায় কি আছে দেখিবার জন্য কৃপণের ন্যায় অঙ্গুলী দ্বারা সূর্য্যপ্রদীপ সঞ্চালন করিয়া দেখিতেছেন। পৃথিবীর পাপ অন্ধকার দূর হইবার সময় আসিতেছে। দূরে পর্ব্বতশৃঙ্গে তরল কুজ্মটিকার মত মেঘ ভাসিতেছে। মেঘ ক্রমে আরও তরল হইতেছে, আর ধীরে ধীরে আলোক ফুটিতেছে। পূর্ব্ব রাত্রের তারাগুলি একে একে অদৃশ্য হইয়া গেল আবার নূতন দিন আরম্ভ হইল। নারায়ণ নরকে দিয়া পৃথিবীর পাপভার দূর করিবেন।

ধীরে ধীরে সুখের উষা উঠিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ এখনও আলো আঁধারমাখা মুখজ্যোতি ঢাকিয়া আছে, গোলাপী আঙ্গুলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, চুলগুলি সরাইতে সরাইতে, পরিধেয় বস্ত্র সামলাইতে সামলাইতে উষা উঠিল। ক্ষেপা মেয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, ঘুমঘোর এখনও ছুটে নাই। আলস্যশিথিল পাগল পাগল আকার প্রকার বড় সুন্দর।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য উঠিলেন। দূরে পর্ব্বতশৃঙ্গ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া ঝক্ মক্ করিয়া উঠিল। প্রথমআলোকরেখা স্পর্শে ফুলরাণী ঘোমটা খুলিল। নীচে শিশির মাখিয়া পার্ব্বতীয় তরুলতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আর পার্ব্বতীয় পক্ষিকুল গান ধরিল। পৃথিবী হইতে পাপান্ধকার ছুটিয়া গেলে তৃণলতা পশু পক্ষী মানব দেবতা সারা বিশ্ব আনন্দে ফুটিয়া উঠে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সাত্ত্বিক সময়। লোকে বলে পক্ষিজীবনে আহার নিদ্রা ইত্যাদি ভিন্ন কার্য্য নাই। কিন্তু পক্ষী ঠিক পক্ষীই নহে। কি জানি কত জন্মের সংস্কার প্রাণে ভরা থাকে, সাত্ত্বিক মুহূর্ত্তে প্রাণে কোন্ পিপাসা জাগে। পাখীই কি আর মানুষই কি সমস্তই গুণের খেলা মাত্র। সাত্ত্বিক মুহূর্ত্তে পাখী সাত্ত্বিক ভাবে বিভোর হইয়া সুন্দর স্বরে নিশ্চিন্ত হইয়া কাহার গুণ গায়? তখন ত আহারের চেষ্টা থাকে না। পাখী নিশ্চিন্ত হইয়া কেন গায়?

ঋষিগণ এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বেদপাঠ করিতেন। তুমি এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্তবস্তুতি পাঠ করিয়া দেখিও কি এক সাত্ত্বিক প্রবাহে সমস্ত জড়ত্ব কাটিয়া যাইবে, হৃদয় কি এক আনন্দে পূর্ণ হইবে।

পাখী গান ধরিল আর রৈবতকে দুই চারিটী লোক দেখা দিল। তখনও উৎসব আরম্ভ হয় নাই। উৎসবের সংবাদ মথুরা বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়াছে। কৃষ্ণ রৈবতকে আসিবেন, কতকগুলি ব্রজবাসী এখানে আসিয়াছে; পূর্ব্ব দিন কৃষ্ণ আসিয়াছেন, ব্রজবাসীগণের আনন্দের সীমা নাই।

দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ-ভবনে নিদ্রাভঙ্গসূচক তূর্য্য ও শঙ্খ সকল বাজিয়া উঠিল। বৈতালিক, সূত, মাগধ, বন্দী স্তুতি

আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ-ভক্ত প্রভাতী গাহিল "শ্যামগলে বনমালা বিরাজে রাইগলে মতিরাজে।"

রৈবতকে প্রভাত হইল। কৃষ্ণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দুই দশজন যাদব সঙ্গে রৈবতক সজ্জা দেখিতে বাহিরে আসিলেন। একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ ফল ফুল শর্করা হস্তে কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভক্তগণ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

রৈবতক পর্ব্বত স্বভাবতঃ মনোহর। এখানে নানাবিধ মণি মরকত পাওয়া যাইত। নানাজাতি বৃক্ষ ফলে পত্রে শোভা করিত, নানাজাতি ফুল সৌরভে আমোদ করিত, নানাজাতি পশু পক্ষী আনন্দে এই পর্ব্বতে ক্রীড়া করিত।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যদি ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য হয় তবে সে অসার ক্ষণিক চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজন কি? এত মহান্, এত উচ্চ পর্ব্বতনিচয় ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য? ইহারা যেন নিরন্তর কোন বিস্মৃতি অবস্থা স্মৃতিপথে জাগাইয়া দিতেছে। পর্ব্বত মানুষের বহু উপকার করে। মানুষের দেহাভিমান সঙ্কীর্ণ করিয়া মানব চিত্তকে উৎপত্তি মুখে আকর্ষণ করে। হৃদয়মধ্যে অনন্তের ভাব জাগাইয়া অনন্তের দিকে আকর্ষণ করে। পর্ব্বতের প্রাণ আছে। পর্ব্বত আরোহণ কালে প্রণাম করিয়া আরোহণ করিতে হয়। প্রার্থনার মত প্রার্থনা করিতে পারিলে পর্ব্বত ও প্রার্থনা পূর্ণ করে। জগতে নির্জ্জীব কিছু কি আছে? সকলেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। সর্ব্বত্রই জড় চৈতন্য মিলিত।

পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ অনন্তজ্ঞান অনন্ত আনন্দস্বরূপ সেই নিত্যবস্তু কোথায় নাই? পূর্ণের অভাব কি হয়? আছেন সর্ব্বত্র কিন্তু সর্ব্বত্র ভাসেন না। সঙ্কল্প বাসনা কামনার আড়ালে

পড়িলে সেই বস্তু দেখা যায় না। চক্ষের উপর অঙ্গুলি আড়াল পড়িল সূর্য্য দেখা গেল না, ইহাতে সূর্য্য নাই প্রমাণ হইল না, তুমি দেখিতে পাইলে না ইহাই প্রমাণ হইল।

যে বস্তু "অনোরনীয়ান্" "মহতো মহীয়ান্" যে বস্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সাজিয়া আছে, সেই অনন্ত পরব্রহ্ম সমুদ্রে নিরন্তর জীব-বীচি উঠিতেছে, পড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে ভাসিতেছে, খেলা করিতেছে—অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড ত্রস রেণুর মত শত শত বার তাঁহাতেই উঠিতেছে, তাঁহাতেই লয় হইতেছে। মহান্ দেখিতে দেখিতে চিত্ত মহানই হইয়া যায়, পর্ব্বত বড় উপকার করে। ইহা আমাদের অহং অভিমান সরাইয়া দেয়, অহং ক্ষয়ে যাহা হয় তাহাতেই চিত্ত চমৎকৃত। চিত্ত জড় সংসার ছাড়িয়া সেই বস্তুর আভাষ পাইলে আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠে—

অহো ভুবনকল্লোলৈ র্বিচিত্রৈ র্দ্রাক্ সমুত্থিতম্।
ময্যনন্ত মহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে।

কখনও বা বলে—

ময্যনন্ত মহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি
অভাগ্যাজ্জীব বণিকো জগৎ পোতো বিনশ্বরাঃ।
ময্যনন্ত মহাম্ভোধৌ আশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ॥

চিত্ত শান্ত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা বিচার করে, মহীয়ান্ ব্রহ্ম সমুদ্রে লহরী উঠিতেছে, তোমার আমার কি? সমুদ্র বক্ষে বুদ্বুদ ভাসিতেছে, ভাঙ্গিতেছে কার কি? লহরীকে তোমার করিয়া লও তরঙ্গ ভাঙ্গিলে বুদ্বুদ লয় হইলে ক্লেশ হইবে; কিন্তু আপন হৃদয় ঐ উন্নত পর্ব্বতের মত উন্নত কর, উন্নত বস্তু সহবাসে উন্নত

হইয়া আপনার স্বরূপ দেখ, দেখিবে সব শান্ত হইয়া গিয়াছে; সব পিপাসা, সব জ্বালা জুড়াইয়াছে, সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তির পথে আসিতেছ। প্রাণকে ক্ষুদ্র কর, মনকে ক্ষুদ্র দেহ কূপে ডুবাইয়া রাখ, চৌদ্দ পোয়া দেহটি আমি, দেহের সম্পর্ক যাহার যাহার সহিত, তাহাই "আমার আমার" করিয়া ফেল, অনন্ত দুঃখ পাইবে, তোমার শান্তি কখনও হইবে না। অহংকে দেহে ব্যাপিয়া রাখ চিরদুঃখী হইবে; আর অহংকে দেহ হইতে ছাড়াইয়া আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি জল স্থল বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী সারা ব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত কর—শুধু দেহটিই আমি না বলিয়া যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গোচর তাহাই আমি বল, অথবা "আমি কে" সেই ইন্দ্রিয়াতীত, দৃশ্যপ্রপঞ্চাতীত গুণাতীত প্রকৃতির পর সেই সচ্চিদানন্দে প্রসারিত কর তুমি মুক্ত হইবে। ইহা না পার তোমার জ্বালা জুড়াইবে না কতবার জন্মিবে কতবার মরিবে সেই জ্বালা সেই অশান্তি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবে। যত দিন না হৃদয় সমুদ্রের মত বিশাল হয়, যত দিন না মন পর্ব্বতের মত উচ্চ হয়, যত দিন না মানব-জাতি তোমার দৃশ্য বস্তু হইয়া যায়, যত দিন না অনন্ত লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে পার, ততদিন তুমি জুড়াইতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম সাগর, পর্ব্বত ইহারা বড় উপকার করে।

আবার বলি এই সমুদ্রোপকুলবর্ত্তী রৈবতকে দণ্ডায়মান হও, সমুদ্রবক্ষে জল ও বায়ুর উন্মত্ত সংগ্রাম লক্ষ্য কর, উভয়ে ক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বত-পাদমূলে ঘাতপ্রতিঘাত করিতেছে লক্ষ্য কর, কি এক অনন্ত শক্তি তোমায় আকর্ষণ করিবে। এই শক্তির তুলনায় তোমার শক্তি কতটুকু? হিমালয়ের তুলনায় তুমি কত ক্ষুদ্র আবার ব্রহ্মের তুলনায় হিমালয়ও অতি ক্ষুদ্র। তবেই সেই

অনন্ত বস্তুর নিকটে তুমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। দেহাভিমান মানবের সমস্ত দুঃখের মূল। যে ক্ষুদ্র দেহাভিমান তোমাকে বড় করিয়া ভগবানকে ছোট করিয়া রাখিয়াছিল, যে ক্ষুদ্র অহঙ্কার তোমার অস্তিত্ব এত বর্দ্ধিত করিয়াছিল, যাহাতে তুমি ঈশ্বর অস্তিত্বে সন্দিহান ছিলে, বায়ু-তাড়িত পর্ব্বত-প্রমাণ সাগর-তরঙ্গ উন্নত পর্ব্বত অঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত করিতে করিতে তোমার হৃদয়ে যে মহাশক্তি প্রবুদ্ধ করিবে, তদ্দ্বারা তোমার মিথ্যা অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। অঙ্গুলির অন্তরাল ঘুচিয়া যাইবে, সূর্য্য প্রকাশিত হইবে। তখন "অহং" আর এই ক্ষুদ্র দেহে আবদ্ধ থাকিবে না, ইহা আকাশের মত সীমাশূন্য হইয়া পর্ব্বত সমুদ্র ক্রোড়ীভূত করিবে, "ক্ষুদ্র আমি" প্রসারিত হইয়া "বৃহৎ আমি" হইয়া যাইবে। উচ্চ ভাব দেখ, মানবজাতিকে আমি বলিতে শিক্ষা কর। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। "আমারই কলেবর" এই ভাব জাগ্রত করিতে অভ্যাস কর, জীবিতোদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে।

এই রৈবতক বহু পূর্ব্ব হইতে বিখ্যাত। আচার্য্য দ্রোণ একলব্যের নিকটে বহু দিন এই পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ এই স্থানে আসিয়া এক ব্রজবাসীর পানে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিলেন। ব্রজবাসী কি এক অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছে। ভাবিতেছে ভগবানের পদরজ স্পর্শে আজ রৈবতকের সৌন্দর্য্য। কৈ এত সুন্দর ত ছিল না; আজ যেন ইহার প্রতি বৃক্ষ প্রতি পত্র সজীব বোধ হইতেছে। আজ যেন রৈবতকের প্রতি বস্তু ভগবানের রূপ অঙ্গে মাখিয়া হেলিয়া দুলিয়া কথা কহিতেছে। যখন তরুলতা, জল, স্থল, আকাশ, বায়ু সকলেই ভগবানের কথা কয়, যখন মানুষ আবার তাহাই অনুভব করে, মানুষ আর

নিজের জন্ম ভাবিতে পারে না, সকলেই মানুষের কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়, মানুষ তাহাদের সহিত আপন প্রাণ মিশাইয়া সেইরূপে তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করে। যখন দেখিতে থাকে সমস্ত বহিঃপ্রকৃতি তাহাকেই ইঙ্গিত করিতেছে, তাহাকেই ডাকিতেছে, তাহাকেই উৎসবে যোগ দিতে বলিতেছে, তখন আর মানুষের সঙ্কীর্ণতা থাকে না। সকলে মিলিয়া তাহাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়, সে তখন বৃক্ষের কোলে কোলে জ্যোতি দেখিতে পায়, পত্রে পুষ্পে মূর্ত্তি দেখিতে পায়। কত বার বলিয়া উঠে—

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥

রৈবতকে যে স্থানে একলব্যের আশ্রম ছিল, কৃষ্ণ সেই স্থানটীকে নিতান্ত রমণীয় করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। নানাবিধ পার্ব্বতীয় বৃক্ষের মধ্যে আশ্রম। শ্রীকৃষ্ণ ঐ আশ্রমের নিকটে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বত হইতে দুইটী নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইয়া দুই পার্শ্বে কুঞ্জাভিমুখে গিয়াছে। প্রায় পাঁচ শত সোপান অতিক্রম করিলে একটী সরোবর দৃষ্ট হয়। নানাবিধ পার্ব্বতীয় বৃক্ষলতা ঐ সোপানাবলীর দুই পার্শ্ব হইতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। সরোবরের কিছু দূরে অনতিউচ্চ পর্ব্বতমালা। স্থানটী অতিশয় নির্জ্জন। নানাবিধ বন-বিহঙ্গের কাকলীতে নিরন্তর কূজিত হইতেছে। উপরে প্রাসাদ, আর নীচে এই নির্ঝরিণী তটে চারিটী কুঞ্জ। যেস্থানে ঐ দুইটী নির্ঝরিণী আসিয়া মিলিয়াছে, সেই স্থানটী লতাকুঞ্জের পাদপীঠ। ঐ স্থানে লতাবেষ্টিত বড় বড় সরল বনজ

বৃক্ষ স্তম্ভাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উপরে বৃক্ষে বৃক্ষে পাতায় পাতায় সংলগ্ন হইয়া নীচে কতকগুলি মণ্ডপ সৃজন করিয়াছে। মধ্যে একটী বৃহৎ মণ্ডপ আর চারিধারের মণ্ডপগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। চারি মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে কোথাও কামিনী কোথাও মল্লিকা কোথাও কুন্দপুষ্পের বন। মণ্ডপগুলি কৃষ্ণের আদেশে গৃহের মত সজ্জিত করা হইতেছে। মণ্ডপ মধ্যে অনতিবৃহৎ শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড। মধ্যে মধ্যে বসিবার স্থানে নানাবিধ ফুলের গাছে ফুল ধরিয়াছে। গুঞ্জনোন্মত্ত মধুব্রত ফুলে ফুলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুপান করিতেছে। লতাকুঞ্জের লতাগুলি বৃক্ষ-গাত্রে এরূপ ভাবে জড়িত যে স্থানটীতে আদৌ সূর্য্যকিরণ আসিতে পারে না।

কুঞ্জের সম্মুখেই সরোবর। কত কহ্লার, কত কুমুদ, কত উৎপল সরোবরে ফুটিয়া রহিয়াছে। হংস কারণ্ডবাদি বিহঙ্গ কুল জলে খেলা করিতেছে। সরোবরতীরস্থ উদ্যানে ছোট বড় নানাবিধ পুষ্পবাটিকা। ঐ সমস্ত পুষ্পবাটিকা কৃষ্ণের আজ্ঞায় নিরন্তর কর্পূর, ধূপ, ধুনা গুগ্‌গুল গন্ধে আমোদিত থাকিত। সমস্ত কুঞ্জটী উপর হইতে দেখিতে একটী বিকশিত পদ্মের মত। যেমন সুধাসমুদ্রমধ্যবর্ত্তী মণিদ্বীপের মধ্যভাগে চিন্তামণি গৃহ, সেই গৃহের শৃঙ্গার মণ্ডপ, মুক্তি মণ্ডপ, জ্ঞান মণ্ডপ, ও একান্তমণ্ডপ, এস্থানের মণ্ডপ গুলিও সেইরূপ।

কৃষ্ণ নির্ঝরিণী কুঞ্জটী পরিদর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। সহসা সত্যভামার কথা মনে হইল, সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরের প্রাসাদে আসিলেন।

আহারান্তে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে রথ যোজনা করিতে বলিলেন। যে রথে সুগ্রীবাদি অশ্ব, ইহা সে রথ নহে। সে রথ দ্বারকায়

ছিল। দারুক প্রভাসাভিমুখে রথ চালাইল। আর ঐ সময়ে দ্বারকায় গোবিন্দের রথ গোপনে সুসজ্জিত হইল। রথে সারথি ছিল না। সত্যভামার ইচ্ছায় কৃষ্ণ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দ্বারকা হইতে রৈবতক দুর্গ পর্য্যন্ত যে গোপনীয় পথ প্রস্তুত ছিল, সেই পথে ভদ্রা ও সত্যভামা বহুবার রথারোহণে যাতায়াত করিয়াছেন। দুর্গ হইতে উৎসবের প্রাসাদ দেখা যাইত। সত্যভামা ও ভদ্রার আগমন জন্য কতকগুলি দাসী নির্ঝরিণী কুঞ্জে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

রৈবতক যাত্রা।

ভদ্রা। এত গোপন কেন?

সত্যভামা। চুপ।

ভদ্রা। আর কেহ যাইবে না?

সত্যভামা। এখনও বিলম্ব আছে।

সন্তর্পণে এই মাত্র কথা হইল। আর সত্যভামা ও ভদ্রা দ্বারকার রথে আরোহণ করিলেন। দুই দাসী রথের উপরে অপেক্ষা করিতেছিল।

ভদ্রার বেশ বড়ই সুন্দর। রুক্ষকেশপাশ আলুলায়িত। পরিধানে রক্তাম্বর। ভদ্রা রথে চড়িয়া অশ্ববল্গা ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে রথ বিদ্যুৎগতিতে ছুটিল। রথ চালনে ভদ্রার পারদর্শিতা দেখিয়া সত্যভামা বহু প্রশংসা করিতেন। এমন কি কৃষ্ণও আশ্চর্য্য হইতেন। আজ ভদ্রা বড়ই উৎসাহে রথ চালাইতেছে। নিমেষ মধ্যে রথ দুর্গের বাহিরে আসিল। পার্ব্বতীয় প্রদেশে সূর্য্যের উত্তাপ বড়ই প্রখর। উভয়ে আতপ-তাপে পরিশ্রান্ত হইলেন। দুর্গ হইতে প্রথম উত্‌রাই পার হইতে না হইতে উভয়ে ঘর্ম্মাক্ত হইলেন। মধ্যে কোন বিশ্রামের স্থান নাই। দুই দাসী ঘন ঘন ব্যজন করিতে লাগিল। সত্যভামাও পিপাসার্ত্ত হইয়াছেন। একটি পার্ব্বতীয় ফলে তিনি আপন পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছিলেন। সহসা ভদ্রার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ভদ্রার পিপাসা অনুভব করিয়া সত্যভামা আর একটী ফল ভদ্রাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। ভদ্রার দুই হস্তই আবদ্ধ।

ভদ্রা তখন হাসিতে হাসিতে সত্যভামাকে ইঙ্গিত করিলেন। সেই সময়ে চড়াইয়ের মুখে রথ আসিল। অশ্ব চতুষ্টয় চড়াইয়ে উঠিতে বল প্রয়োগ করিল, রথ অতি বেগে আন্দোলিত হইল, দাসীদ্বয় অন্যমনস্ক হইল, এই অবসরে সত্যভামার মুখ হইতে ভদ্রা মুখে মুখে ফল গ্রহণ করিল। আর সত্যভামা ভদ্রার বায়ুবিগড়িত চূর্ণকুন্তল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন।

যেন আর কিছুই হয় নাই। এরূপ কিন্তু কতবার হইত। ভদ্রা ও সত্যভামা সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিত। কৃষ্ণ থাকিলে ভদ্রা অনেক সময়ে রোহিণীর নিকটে যাইত, কখন কৃষ্ণের নিকটে আসিত। কিন্তু ভদ্রার শয়নগৃহ স্বতন্ত্র। কৃষ্ণ না থাকিলে ভদ্রা সত্যভামার নিকটে থাকিত, এক সঙ্গে ভোজন করিত, এক সঙ্গে শয়ন করিত। সত্যভামার শ্রীকৃষ্ণ ছিল। ভদ্রার ভক্তিভাব সত্যভামার স্পর্শে জাগ্রত হইত, তখন নানা ভাবে কৃষ্ণকথার স্ফুরণ হইত। ভদ্রার সত্যভামা না হইলে চলে না। ভদ্রা সর্ব্বক্ষণ সত্যভামাকে পাইত না, যখন পাইত তখন আনন্দ ধরিত না। ভদ্রার পিপাসা কথঞ্চিত নিবারিত হইল। রথ ধীরে ধীরে চড়াই পার হইয়া উপরে উঠিল, এবং পশ্চিম দিকে সূর্য্য রক্তিম বর্ণ ধারণ করিলেন।

রথ হইতে অবরোহণ করিবামাত্র দাসীগণ দৌড়িয়া আসিল। ভদ্রা সত্যভামার হাত ধরিয়া নির্ঝরিণী কুঞ্জের দিকে চাহিলেন, আশ্রম বাটিকায় যাওয়া হইল না। পরিচারিকা ছয় জন আশ্রমে গেল।

সত্যভামা। চল্ আশ্রমে বিশ্রাম করি।

ভদ্রা। স্নান করিয়া পরে--

সত্যভামা। এই সন্ধ্যায়?

ভদ্রা কোন উত্তর দিল না। বনকুরঙ্গিণীর মত এক সোপান হইতে অন্য সোপানে অবরোহণ করিতে লাগিল। সত্যভামাও চলিলেন, কিন্তু সত্যভামার সেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পাঁচ শত সোপান অতিক্রম করিলে সরোবরতীরে কুঞ্জ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সত্যভামাকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া ভদ্রা মধ্যে এক সোপানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। মাথার উপর লতাজড়িত বৃক্ষ, বৃক্ষশাখে নানাবিধ বিহঙ্গ কলরব করিতেছে। ভদ্রা সোপানোপরি শয়ন করিল। সত্যভামা সেইখানে আসিয়া বসিলেন; বসিয়া ভদ্রার মস্তক আপন ঊরুদেশে স্থাপন করিলেন। ভদ্রা একবার সত্যভামার মুখের দিকে চাহিল। সত্যভামা আজ কিছু আন্‌মনা। ভাবিতেছেন—'আমার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হইবে না? চিরদিনই ঠাকুর আমার বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই। কিন্তু আমার অভিলাষ ত তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি নাই? নাই বলিলাম—তিনি না অন্তর্য্যামী? তিনি ত সকলি জানেন, আবার কি বলিব? বলিলে ত সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারে; কিন্তু তিনি? তিনি কি জানিতেছেন না? আমাকেও যদি সব অভিলাষ খুলিয়া বলিতে হইবে, তবে নাই বলিলাম।'

সত্যভামা একবার ভদ্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভদ্রা সত্যভামার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া স্থানটীর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল।

সত্যভামা আবার ভাবিতেছেন আমার প্রাণে এ বাসনা জাগাইয়াছে কে? তিনিই ত। তাঁর ইচ্ছায় সকলই হয়, আমি দাসী, তাঁর ক্রীড়ার পুতুল মাত্র। দেখি কি হয়, আমি এই কার্য্য করিবই।

সত্যভামা ভদ্রার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে কি বাৎসল্য আইসে? সত্যভামা এ স্নেহ অনুভব করিলেন। আজ ভদ্রার আকার ইঙ্গিতে যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ করিতেছে। আজ ভদ্রার সম্মুখে ঢল ঢল ছল ছল কি যেন কি ভাসিতেছে, যেন সর্ব্বত্র একটা পলকশূন্য দৃষ্টি, যেন কোন ভাষাশূন্য ভাব সারা প্রকৃতিতে মাখা বোধ হইতেছে। ভদ্রা সহসা বলিয়া উঠিল "চল আমরা নির্ঝরিণী কুঞ্জে যাই।" সত্যভামা এতক্ষণ ভদ্রার মুখের পানেই চাহিয়াছিলেন, বলিলেন "চল যাই। ভদ্রা আজ তোরে বড় সুন্দর দেখাইতেছে। এই সুন্দর ফুরল রুক্ষ কুন্তল—নীল আকাশে চঞ্চল মেঘের মত, আর এই অলকামণ্ডিত মুখমণ্ডল! ভদ্রা! তুই এত সুন্দরী হইলি কিরূপে?"

ভদ্রা উঠিল। তখন উভয়ে সরোবরতীরে আসিলেন। ভদ্রা স্নান করিতে চায়, সত্যভামা নিবারণ করিলেন; আর উভয়ে দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়া ভিতরের মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মণ্ডপের ভিতরে শুভ্র কৃষ্ণ নানাবিধ প্রস্তর খণ্ড। উভয়ে একটী প্রস্তর খণ্ডের উপরে উপবেশন করিলেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল, পক্ষীদিগের কোলাহল মন্দীভূত হইতেছে। চন্দ্রকিরণবিধৌত মণ্ডপ বড় সুন্দর হইল। ভদ্রা প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া যাইতেছিল। সহসা সত্যভামাকে ভদ্রা দেখাইতেছে—দেখ সখি! গাছের উপরে দুইটী পার্ব্বতীয় কপোত কপোতী দেখ কত আদর করিতেছে; বড়ই সুন্দর দেখ।

সত্যভামা ভদ্রার মুখচুম্বন করিলেন, বড় আদর করিলেন। ভদ্রার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ। ভদ্রার ভালবাসা রাখিবার পাত্র

মিলিয়াও মিলিতেছে না। যতদিন এই অবস্থা থাকে ততদিন সকল বস্তুতেই ভালবাসা ছড়াইয়া থাকে। আবার আধার মিলিলে, মিলনকালে সমস্ত ভালবাসা গুটাইয়া সেই আধারে আনন্দঘন মূর্ত্তি গড়ে। প্রকৃত ভালবাসায় একের মধ্যে সব দেখা যায়, আবার সময়ে সবের মধ্যে এক দেখা যায়। ভদ্রার এ অবস্থা আইসে নাই। ভদ্রা তাই যত্ন করিয়া কত ফুলের গাছ লাগাইত, প্রত্যহ গাছে আপনি জল দিত, প্রত্যহ আঁচল দিয়া একটী একটী করিয়া বৃক্ষের পত্রগুলি মুছাইয়া দিত। ফুল ফুটিলে আনন্দের সীমা থাকিত না। কখন সত্যভামার কেশ-রাশি পুষ্প গুচ্ছে সজ্জিত করিত, কখন মালা গাঁথিয়া অলক্ষ্যে সত্যভামার গলে পরাইত। সত্যভামা তাহাই আবার কৃষ্ণকে দেখাইতেন, আর কৃষ্ণ কত রহস্য করিতেন। ভদ্রা কপোত কপোতী দেখাইল। সত্যভামা প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বুঝিলেন। ভদ্রা নিজের প্রাণ নিজে বোঝে না।

ভদ্রা তখন সত্যভামাকে জিজ্ঞাসা করিল "এই কুঞ্জবাটিকা কি একলব্যের আশ্রম ছিল?"

সত্যভামা। উপরে একলব্যের আশ্রমস্থানে আমাদের প্রাসাদ হইয়াছে।

ভদ্রা। সখি! একলব্যের গুরুভক্তির কথা কতবার শুনিয়াছি, কি অপূর্ব্ব গুরুভক্তি!

সত্যভামা। সত্যই। কিন্তু অর্জ্জুনকে গুরুদ্রোণ কতই ভালবাসিতেন; বাল্যকালে গুরুদ্রোণ সঙ্গে অর্জ্জুন এই স্থানে আসিয়াছিলেন। শুনিয়াছি এই স্থানেই অর্জ্জুনের জন্য একলব্য হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। তখন একলব্যের কথা উঠিল। ভদ্রা বলিতে লাগিল বহুবার

শুনিলেও একথা পুরাতন হয় না। কি অদ্ভুত শিক্ষা ইহাতে আছে। কি অপূর্ব্ব গুরুভক্তি।

সত্য কথা, ভক্তি বিশ্বাসের কথা বড়ই উপকারী। জীবনে ইহার নিতান্ত প্রয়োজন। যদিও এ তৃপ্তি ক্ষণিক কিন্তু ইহাই নিত্য আনন্দের সংবাদ দেয়।

জগতে প্রচুর দুঃখ আছে। দুঃখের ছবি স্বাভাবিক হইলেও শুধু নায়ক নায়িকার দুঃখ আঁকিয়া ফল কি? ঔপন্যাসিক দুঃখে আজ জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। সকল দুঃখই অজ্ঞানের লীলা। চিন্তা করিলেই দুঃখ আইসে, চিন্তাত্যাগই দুঃখের মহৌষধ। একেবারে চিন্তা ত্যাগ হয় না। ভক্তলীলা, ভগবৎ-চিন্তা, প্রকৃতিতে ভগবান ইত্যাদিতে বিষয় চিন্তা ছুটিয়া যায়, পরে আর কোন চিন্তা থাকে না। নায়ক নায়িকার দুঃখ-কাহিনী পড়িয়া একটা যাহা হউক খুঁজিয়া নায়ক নায়িকা সাজা বহু প্রচার হইয়াছে। জগতের শিক্ষার সহিত ভারতের শিক্ষার বিরোধ দৃষ্ট হয়। ভারত বিষাদের ছবি আঁকিয়াছে তাহার প্রতিকার জন্য। অর্জ্জুন বিষাদযোগী, এই বিষাদ প্রতিকার জন্য গীতা। পরীক্ষিত বিষাদযোগী, এই বিষাদ প্রতিকার জন্য ভাগবত। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যে দুঃখের ছবি আছে, তাহাদের দুঃখ প্রতিকার জন্য চণ্ডী। অশোক বনে সীতার দুঃখ দেখিয়া লোকে নিরন্তর 'রাম রাম' করিতে শিক্ষা করে, অহল্যার সাধনায়, বাল্মীকির তপস্যায়, জীবনের বহু উপকার সাধিত হয়। দুঃখের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া নায়ক নায়িকার জীবনান্ত ঘটে—ইহা সর্ব্বত্র দেখা যায়। গ্রন্থকর্ত্তা যদি ইহার প্রতিকার দেখাইতে না পারেন তবে উহাতে কি কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? দুঃখী জীব অন্যের গুরুতা

দুঃখ দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য আত্মদুঃখ বিস্মৃত হইতে পারে সত্য, পাপের ছবি দেখিয়া কিছু সতর্ক হয় সত্য, কিন্তু কার্য্যকালে কি ফল হয়? এই ক্ষণিক প্রতিকার ভারতের লক্ষ্য ছিল না। ভারতের শিক্ষা মিলনাত্তক। অন্য অন্য জাতি বিয়োগান্তক ছবি আঁকিতেই ভালবাসে। সত্ত্ব ও রজোগুণে যাহা পার্থক্য, ভারত ও অন্যান্য দেশে সেই পার্থক্য। ভারতের পথ যদি আধুনিক সভ্য সমাজের বিরোধী বলিয়া কেহ সমালোচনা করেন, আমরা কি করিতে পারি? সত্যই দেখিতে পাওয়া যায় "আমার বড় কষ্ট" "আমার ভারি দুঃখ" পুনঃ পুনঃ এই চিন্তা করিয়া মানুষ জীর্ণশীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। যদি দুঃখ চিন্তাই করিতে হয়, তবে একবার জগতের অজ্ঞানজনিত দুঃখের চিন্তা করিয়া তদুপশম জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর। কর্ম্মবীর হইয়া কেমন করিয়া দুঃখ জয় করিতে হয় শিক্ষা দাও, ইহাতে বহু দুর্ব্বল জীব জীবন লাভ করিবে। একলব্য চরিত্রে আমরা দুঃখ ও তৎপ্রতিকার উভয়ই দেখি, তাই একলব্য আমাদের শিক্ষা স্থান। উভয়ের কথা আরম্ভ হইল—আমরা তাহাই বর্ণনা করিলাম।

বহু পূর্ব্বে যখন অর্জ্জুন বালক ছিলেন, তখন এই রৈবতক একলব্যের বাসস্থান ছিল। একলব্য রাজপুত্র কিন্তু নিষাদ।

পর্ব্বতের শিখরদেশে এক বিস্তৃত কানন। কানন মধ্যে এক ক্ষুদ্র কুটীর। উপর হইতে সমুদ্রের তরঙ্গমালা পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। ব্রহ্মচারী সংসার ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া জুড়াইয়াছিল। এই স্থানে মৃণ্ময় মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়া সকাম সাধনা করিত। একলব্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিল একটী কথায়। গুরু দ্রোণ কুরুবালকদিগকে অস্ত্রশিক্ষা

দিতেছেন। দ্রোণের সংগ্রামনৈপুণ্য শ্রবণে শত সহস্র শিক্ষার্থী ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য দিগ্‌দিগন্ত হইতে হস্তিনাপুরে আসিতে লাগিল। নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র তাহাদের মধ্যে একজন। একলব্য গুরু দ্রোণের নিকট বিদ্যা যাজ্ঞা করিল। "তুই ম্লেচ্ছ জাতি, সাধারণের সতীর্থ সমতুল্য হইবার অনুপযুক্ত"। গুরু প্রত্যাখ্যান করিলেন। একলব্য দীক্ষা পাইল না। একলব্য বহু অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু উত্তর সেই নিষ্ঠুর বাক্য "তুই নীচ-জাতি তোরে দীক্ষা দিলে অখ্যাতি হইবে।"

তখন নিষাদের প্রাণে সুপ্ত উৎসাহ জাগ্রত হইল। দৃঢ় অধ্যবসায় প্রবুদ্ধ হইল। "মন্ত্রং বা সাধয়েৎ, শরীরং বা পাতয়েৎ" নিশ্চয় হইয়া গেল। নিষাদ গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। নিষাদ বেশ দূর করিল, জটা বল্কল পরিধান করিল, হইল ব্রহ্মচারী। দিনান্তে একবার কন্দমূল ফল আহার করিত, ঝরণার জল পান করিত, কিন্তু প্রাণে অদম্য গুরুভক্তি জাগিল। আমি নীচ জাতি, বিদ্যার অধিকারী নই, গুরু দিলেন না। আমি নির্জ্জনে তাঁহারই উপাসনা করিব। তাঁহাকেই প্রসন্ন করিব, উপযুক্ত হইলে তিনি কৃপা করিবেন। অন্য গুরুর চেষ্টা হইল না, যে গুরু উপেক্ষা করিলেন তাঁহাকেই প্রসন্ন করিব, আমি উপযুক্ত হইলেই তিনি প্রসন্ন হইবেন। ইহাই প্রকৃত শিষ্যত্ব।

একলব্য সমাজে থাকিতে পারিল না। "অব সব বিষসম লাগই" লোক সঙ্গ বিষসম লাগিতে লাগিল। সমাজ ছাড়িয়া ই সাগর উপকূলবর্ত্তী নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরস্থ কানন আশ্রয় রিল। মৃণ্ময় দ্রোণ মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাতে আচার্য্য ভাব স্থাপন রিল, ব্রতধারণ করিয়া নানা ফুলে গুরু পূজা করিত।

প্রথম প্রথম শান্তি কিছুতেই ছিল না। কিছুতেই সুখ নাই। ক্রমে প্রকৃতি শিক্ষা দিতে লাগিল। বিশাল সমুদ্র জ্বালা দেখিয়া আপনার ক্ষুদ্র জ্বালা ভুলিতে লাগিল। অনন্ত আকাশ ব্যথিতকে বড়ই শান্ত করিত, একলব্য সব ভুলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত—কি এই অনন্ত আকাশ। পর্ব্বত বা সমুদ্র পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে নাই, সীমাশূন্য ইহারা নহে, কিন্তু এই আকাশ—কোথায় ইহা নাই? সকলের নিকট সর্ব্বদা সমভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আকাশও সজীব। আকাশ অর্থ অবকাশ। যেখানে আকাশ অথবা যেস্থান অন্য বস্তু দ্বারা পূর্ণ সর্ব্বস্থানেই পরিপূর্ণ চৈতন্য পদার্থ আছেন। সেইজন্য অবকাশে ব্রহ্মবস্তু পরিপূর্ণরূপে আছেন। প্রাণশূন্য কোন কিছুই জগতে নাই। ব্রহ্মের শক্তির নাম প্রকৃতি। প্রথম অবস্থায় শক্তি অব্যক্ত। অব্যক্তের প্রথম ব্যক্তাবস্থা এই শব্দবৎ আকাশ। শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয় এজন্য ছন্দযুক্ত শব্দই বেদ। বেদকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়। ব্যক্ত প্রকৃতির কোলে কোলে পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। তাই আকাশকে জীবন্ত ভাবিতে পারিলে—ব্রহ্মপদার্থের সাদৃশ্য অনুভবে আসিবে। তার পর ইহার শক্তি! কি অনন্ত শক্তি ইহার! অধিক শক্তি না থাকিলে কেহ কি কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে? আকাশ কাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে?

এই বিপুলা পৃথিবী শূন্যে ঝুলিতেছে, এই সমুদ্র পৃথিবীর সঙ্গে শূন্যে অবস্থিত। এই পৃথিবী সমুদ্রবেষ্টিত। আবার সেই সমুদ্র মধ্যে অন্য পৃথিবী, আবার তাহার চারিধারে সমুদ্র, আবার পৃথিবী, আবার সমুদ্র—আশ্চর্য্য! সকল গুলিই শূন্যে রহিয়াছে বালকে জিজ্ঞাসা করে যদি পৃথিবী অপেক্ষা জল বেশী, ন পৃথিবী কমলা লেবুর মত গোল, তবে জল গড়াইয়া পড়িয়া য

না কেন? বালকের প্রশ্ন, পৃথিবীর আকর্ষণে জল আকৃষ্ট। আবার ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম এবং অপরাপর গ্রহ নক্ষত্রাদি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া সকলে শূন্যে ঝুলিতেছে। এই মহাশূন্য কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডকে স্থান দিয়াছে। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ধারণা হয় না, আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কল্পনায় উর্দ্ধে উঠ, অথবা নিম্নে পৃথিবী তলে কল্পনা প্রেরণ কর, সর্ব্বোচ্চে উঠ এই আকাশ, সর্ব্বনিম্নে চল এই আকাশ, ইহার শেষ কোথায়? একলব্য বিভোর হইয়া আপনাকে আপনি বলিয়া উঠিত—একলব্য তোমার ক্ষুদ্র দুঃখ হারাইয়া যাইবে যদি এই মহাশক্তি তুমি চিন্তা কর। অনন্ত কি—ইহা ধারণা কর, কি হইয়া যাও অনুভব কর।

এই পৃথিবী সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে, আরও কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, সূর্য্য কেন্দ্রদেশে, আর পৃথ্যাদি বৃত্ত অঙ্গে; আবার এই পৃথিব্যাদি সমন্বিত সূর্য্যমণ্ডল আর এক সূর্য্যমণ্ডলের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম, ভাষা নাই যদ্দ্বারা ইহা প্রকাশ করা যায়, শুধুই বলা হয়, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড এই মহাশূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই মহাশূন্য! এই মহাব্যোম! কি বিস্ময়কর! এস এই মহাশূন্যকে আমরা শতকোটী প্রণাম করি। এই মহাশূন্য আবার তাঁহার কল্পনায় অবস্থিত, এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার এক দেশ মাত্র।

একলব্য কখনও নক্ষত্রপানে চাহিয়া থাকিত। কখনও নক্ষত্র গণিতে চেষ্টা করিত। গভীর রজনীতে সমস্ত আকাশ ছাইয়া যখন নক্ষত্রমালা পরিদৃশ্যমান হয়, এক, দুই, তিন, অনন্ত নক্ষত্র, গণনা করা কি যায়? এক একটী নক্ষত্র এক

একটী সূর্য্য, জড় বিজ্ঞান বলে এক, একটী সূর্য্য এতদূরে রহিয়াছে, এত উচ্চে ঝুলিতেছে যে তাহাদের জ্যোতিঃ এই পৃথিবীতে আসিতে যুগ যুগান্তর লাগিবে।

দৃশ্যমান সূর্য্যের চারিধারে যেমন পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহাদি ঘুরিতেছে, সেইরূপ এই সমস্ত সূর্য্যের চারিধারে কত কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কি বিস্ময়কর ইহাদের গতি! অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড গতিশীল, একটীর সহিত আর একটীর সঙ্ঘর্ষণ হয় না, একটী আর একটীকে স্পর্শ করিলে কে কাহার উপর পতিত হয়, কোন্ মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় কে বলিবে? এক একটি করিয়া সমস্ত নক্ষত্রই পৃথিবী অপেক্ষা বড়, সমস্তই শূন্যে ঝুলিতেছে। মহাশূন্য সঙ্কল্পে ঝুলিতেছে, কি এই মহাশূন্য অনুভব করিতে চেষ্টা কর, হৃদয়ে অনন্তের ছায়া পড়িয়া তোমার সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের দুঃখ ভুলাইয়া দিবে।

একলব্য সব ভুলিয়া এই আকাশের পানে চাহিয়া থাকিত। কত কি চিন্তা করিত, নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের জ্বালা বিস্মৃত হইয়া ক্ষণিক শান্তি উপলব্ধি করিত।

আবার কখনও এই অনন্ত জীবসঙ্ঘের কথা চিন্তা করিত। অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ড জীবপূর্ণ। একটী মনুষ্যদেহের একবিন্দু রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখ, অসংখ্য জীব তাহাতে খেলা করিতেছে, সেই জীব-মধ্যে শুক্র শোণিত, তন্মধ্যে জীব, আবার তাহাদের রক্তবিন্দুতে কত সূক্ষ্ম জাব। পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একটী মনুষ্য দেহে কত জীব কে সংখ্যা করিবে? সেই সূক্ষ্ম জীবের মধ্যে প্রাণা-পানের ক্রিয়া চলে, অজ্ঞাত ভাবে মনের সঙ্কল্প বিকল্প চলে, তাহাতেও নিশ্চয়তা আছে। যতই ক্ষুদ্র হউক ভোগেন সকল জীবেরই আছে—ভোগেচ্ছা চরিতার্থতা জন্য বহুর

কর্ম্ম আছে, সমস্তই বিস্ময়কর। আশ্চর্য্য—সূক্ষ্মবস্তুর মধ্যে অণু পরমাণু তনু ত্রসরেণু ইত্যাদিই পর্য্যায়। প্রতি অণুমধ্যে জগৎ ভাসিতেছে, প্রতি পরমাণু মধ্যে সৃষ্টি-পরম্পরা চলিতেছে। বৃহৎ জগতে যাহা চলিতেছে অনন্ত জগতে—স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক—সকল জগতেই তাহা চলিতেছে। প্রতি পরমাণুতে যে জগৎ তাহাতেও চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, নাগ, সাগর, গিরি, দ্বীপ, মহাসাগর, দিগন্তর, লোকান্তর, লোক, গতি, ক্রিয়া, কাল, কলা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ভাব, অভাব, জরা, মৃত্যু সকলই চলিতেছে। যে দিক দিয়াই দেখ সকলই অনন্ত। একটী জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কত জীব, আবার এই জীব যাহার অঙ্গ সেই শরীরী ব্রহ্মাণ্ডে কত জীব কে বলিবে? এইরূপ অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড লইয়া যে বিরাট-পুরুষ, কে ধারণা করিবে সে কত বড়, কত সূক্ষ্ম? ধারণা করিতে চেষ্টা কর, তোমার ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিজনিত দুঃখ দূর হইবে। সেই বিরাট! সেই বিশ্বরূপ! মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া পড়ে, শত নমস্কার করিয়াও তৃপ্তি হয় না, তাই ভক্ত বিশ্বরূপ দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠেন—

বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্যঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্ত বীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বম্
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

একলব্য এই ভাব ধারণা করিত। বিষাদযোগী এই বিরাট ভাব ধারণা করিয়া সব ভুলিয়া যাইত। যে ভাব ভাষায় প্রকাশ করিয়া ঋষিরা স্তব করিতেন ঃ—

তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ
বিশ্বভূতানি তে পাদৌ শীর্ষোদ্যৌঃসমবর্ত্তত।
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃসূর্য্যস্তব প্রভো॥
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং
স্তোতাস্তুতিঃ স্তবা ইহ ত্বমেব।
ঈশ ত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বং
নমোঽস্তু ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥

হে প্রভো! নিখিল বেদ তোমার নিশ্বাসস্বরূপ, অখিল জগৎ তোমার অঙ্গের স্বেদবিন্দু, সমগ্র জীবজগৎ তোমার পাদদেশ, আকাশ তোমার মস্তক, অন্তরীক্ষ তোমার নাভি, বনস্পতি তোমার লোমরাজি, চন্দ্রমা তোমার মন, এবং সূর্য্য তোমার চক্ষু। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড তুমি, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই, এই সংসারে স্তোতাও তুমি, স্তুতিও তুমি, স্তব্যও তুমি। হে প্রভো! তুমিই এই সমস্ত আচ্ছাদন করিয়া আছ, তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।

একলব্য এই ভাবে নিজের ক্ষুদ্রত্ব বিস্মৃত হইত। চিত্তকে বৃহতের আকারে আকারিত করিলে, চিত্ত আপনা হইতে সেই কোটী সূর্য্য প্রতীকাশ, সেই চন্দ্রকোটীসুশীতল আপনার উৎপত্তি স্থানে লয় হইতে থাকে। আবার যখন আপনার ক্ষুদ্র দেহে ফিরিয়া আইসে, তখন ইহার জ্বালা যন্ত্রণা, ইহার ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র সুখ—উপেক্ষার বস্তু হইতে থাকে; লোকের উপর হিংসা, দ্বেষ

ঘৃণা থাকে না; লোকের ক্ষুদ্রতা দেখিয়া অনন্তকৃপাচক্ষে সকলকে ক্ষমা করে। এইরূপে অনন্ত চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত সেই জ্যোতিঃ সমুদ্রে হারাইতে অভ্যস্ত হইলেই সমাধি লাগে, সমাধিভঙ্গে বহু ক্লেশে দেহকে এবং দেহের ক্লেশকে খুঁজিয়া আনিতে হয়। আনন্দ সমুদ্রে ডুব দিতে অভ্যাস করাই পরম পুরুষার্থ।

সমুদ্র, আকাশ, পর্ব্বত, ইহারা অনন্তের দিকে আকর্ষণ করে। এস আমরা আকাশ, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্রকে নমস্কার করি, তুমিও কর।

বিশাল বস্তু হৃদয়ে ধারণ করিয়া একলব্য শান্ত হইতে লাগিল। বনের পক্ষী, বনের হরিণ হরিণী এই সময়ে তাহার সহচর; ইহারা কপটতা জানে না, এক হইয়া আর সাজিয়া থাকে না। ইহারা সরল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া একলব্যকে সরলতা শিক্ষা দিত।

ব্রহ্মচারীর একনিষ্ঠায় দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন। নিষাদ হৃদয় নির্জ্জনে প্রকৃতি সঙ্গ করিয়া প্রবুদ্ধ হইল। একলব্য অস্ত্রবিদ্যা শিখিল, অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধান বিষয়ে অল্প দিনে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিল, মাটীর দ্রোণ ব্রহ্মচারীকে সমস্ত শিক্ষা দিল।

কুরুরাজকুমারেরা এক সময়ে মৃগয়ার্থ ঐ কাননে আসিলেন। হস্তিনাপুর হইতে রৈবতক বহুদূর, কিন্তু রাজপুত্রগণের নিকট দূরত্ব কি? রথে, গজে, তুরঙ্গমে চড়িয়া সকলে মৃগয়ার্থ আগমন করিলেন। এক ব্যাধ আপনার কুকুর ও বাগুরা লইয়া লাক মৃগের অনুসরণ করিল, এবং একলব্যকে দর্শন করিল। কুকুর চিৎকার করিতেছে, একলব্যের তপস্যার বিঘ্ন হইল,

একলব্য আপন অস্ত্র-প্রয়োগের লঘুতা পরীক্ষার্থ কুকুরের মুখ-বিবরে এককালে সাতটী শর নিক্ষেপ করিলেন। অদ্ভুত শিক্ষা এই একলব্যের।

না মরিল কুকুর না হইল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুকুরের রুধিলেক রা॥

কুকুর বাণমুখে ছুটিল। যেখানে রাজকুমারেরা মৃগয়া করিতেছিলেন কুকুর সেই স্থানে গিয়া সম্মুখের পা দিয়া বাণ খুলিতে চেষ্টা করিল। কুরু বালকেরা কুকুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটী শর নিরীক্ষণ করিয়া, অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং শরের লঘুত্ব ও শব্দভেদিত্ব দর্শনে সকলেই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগকর্ত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বহু অনুসন্ধানের পর কুমারেরা মলিন-কলেবর কৃষ্ণাজিন-জটাধারী নিষাদরাজকুমার সন্নিধানে আসিল। যাহা দেখিল তাহাতে বিস্মিত হইল। দেখিল বনবাসী নিভৃত কাননে একাকী নিরবচ্ছিন্ন বাণ বর্ষণ করিতেছে। বিস্মিত হইয়া একজন রাজ-কুমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, নিষাদ আপনার পরিচয় দিল। আবার প্রশ্ন হইল "কাহার নিকট তুমি এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ?" একলব্যের চক্ষে জল, একলব্য কি উত্তর দিবে? বহু কষ্টে বলিল "দ্রোণ আমার গুরু। গুরু আমার কৃপাময়। তিনি শিক্ষা দেন, আমি এই আশ্রমে ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করি।"

প্রশ্নকর্ত্তা অর্জ্জুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণসখা। এই অর্জ্জুন পরে জানিয়াছিলেন "এই সংসারে যথাযোগ্যরূপে পুরুষার্থ প্রয়োগ করিলেই সকলে সকল বিষয় সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব বিশেষের পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত

লাভ করা যায়।” বালক অর্জ্জুন একলব্যের বিদ্যা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল; ভাবিলেন গুরু ব্রহ্মচারীকে আমা অপেক্ষা স্নেহ করেন, আশ্চর্য্য বিদ্যা ইহাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমি কিরূপে এই বিদ্যালাভ করিব? কিরূপে গুরুর সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব?”

সকলেই হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অর্জ্জুন দ্রোণগুরুর প্রিয়শিষ্য। অর্জ্জুন নানা প্রকারে সেবা করিলেন, শেষে গুরুকে একলব্যের কথা বলিলেন। গুরু দ্রোণ আশ্চর্য্য মানিলেন। গুরু অর্জ্জুন সঙ্গে একলব্যের আশ্রমে আসিলেন।

আজ একলব্যের আনন্দ ধরে না। যাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করি সাক্ষাতে আজ সেই মূর্ত্তি। চক্ষে দরবিগলিত ধারা, যাঁহার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছি, তিনি আজ কৃপা করিয়া নিকটে আসিয়াছেন।

একলব্য দূরে থাকিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। কৃতাঞ্জলিপুটে সন্মুখে দাঁড়াইল। কথা কহিবার শক্তি নাই। চেষ্টা করিল, গদ্‌গদ্ বাক্যে ভাব প্রকাশ হইল, ভাষা বাহির হইল না। দ্রোণ ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন “তুমি আমার শিষ্য?”

একলব্য উত্তর করিতে পারে না। কি উত্তর করিবে? রজনীতে শয়ন কালে যে গুরুর চরণ কমলে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইত, মনে মনে যাঁহার সুশীতল চরণকমল স্পর্শ করিয়া ভিতরে কি যেন কি অনুভব করিত, সেই শীতলতা অনুভব করিয়া আত্ম-হারা হইত, জড় দেহ ভুলিয়া যাইত, যে গুরু বিশ্বরূপে দেখা দিতেন, সেই গুরু জিজ্ঞাসা করিতেছেন “তুমি আমার শিষ্য?” একলব্য কি উত্তর দিবে? তুমি আমি কি উত্তর দিতে পারি?

দ্রোণাচার্য্য পরীক্ষা করিলেন। মধুর সম্ভাষণে ডাকিলেন "বৎস"! একলব্য সব ভুলিয়া গেল, সেই কঠোর বাক্য ভুলিল, সেই অভিমান ভুলিল, একলব্যের চক্ষু গুরুমুখকমলে স্থির হইল। ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদ্মমধ্যে উপবেশন করিল। কতক্ষণ পরে শুনিল গুরু বলিতেছেন "বৎস একলব্য, গুরুদক্ষিণা না দিলে বিদ্যা পূর্ণ হয় না।"

একলব্য কৃতার্থ হইয়া গেল। বলিল "আপনি কৃপা করিয়া এ দেশে আসিয়াছেন, অধমের নিকট গুরু দক্ষিণা চাহিতেছেন। প্রভো! আপনি কি আমার দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন? বলিল—

এদ্রব্য সেদ্রব্য নাহি করিব বিচার,
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার,
যে কিছু মাগিবা প্রভু সকলই তোমার॥

ঠাকুর! আমিত ঐ চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি। তুমি যে কৃপা করিয়া আমার দিকে চাহিবে, তাহাত আমার মনে ছিল না। প্রভো! আমি যে নীচ জাতি, আমি যে প্রভু সম্পূর্ণ অনধিকারী!

অদ্ভুত বিশ্বাস এই একলব্যের। বিশ্বাস বড় সুন্দর বস্তু। বিশ্বাসে সব মিলে। বিশ্বাসী বিচার করে না গুরু আমার পণ্ডিত কি মূর্খ। ভক্তির কাছে বিচার প্রথম অবস্থায় হার মানে। অপূর্ব্ব এই গুরুভক্তি। গুরুভক্তিতে সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়। সব জ্বালা জুড়াইয়া যায়। সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হয়।

গুরু দ্রোণ অর্জ্জুনের জন্য একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলী প্রার্থনা করিলেন; একলব্য একবার অর্জ্জুনের দিকে চাহি মনে মনে অর্জ্জুনকে শত বার প্রণাম করিল। তীক্ষ্ণধার অ

অঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া রক্তাক্ত অঙ্গুলী হাস্যমুখে গুরুচরণে সমর্পণ করিল!

ঠিক এই সময়ে রৈবতকে একটা গোল উঠিল। বাদ্যকরেরা জোরে বাদ্যধ্বনি করিল, গায়ক মহোল্লাসে গান ধরিল,—চারিদিকে বড় একটা আনন্দধ্বনি উঠিল।

ভদ্রা তন্ময়ী হইয়া শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া ভদ্রা কাঁদিতেছিল। সহসা রৈবতকে গোল শুনিয়া ভদ্রা চমকিয়া উঠিল; পরমূহূর্ত্তেই বিস্মিত হইয়া দেখিল সত্যভামা নিকটে নাই। সত্যভামার তাচ্ছল্যে ভদ্রার অভিমান আসিতেছে। এই সময়ে এক পরিচারিকা কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিল। ভদ্রা জিজ্ঞাসিল সত্যভামা কোথায়?

পরিচারিকা। মহাদেবী এই মাত্র আপনাকে প্রাসাদে যাইবার জন্য অনুমতি করিয়া অগ্রেই গিয়াছেন।

ভদ্রা। 'এত' --আর এই কোলাহল?"

"ঠাকুর সখা সঙ্গে রৈবতকে আসিতেছেন।" ভদ্রা সকল কথা বুঝিল। ভদ্রার অভিমান দূরে গেল। ভদ্রা তখন ত্বরিত পদসঞ্চারে উপরিস্থিত প্রাসাদাভিমুখে চলিল। প্রাসাদের চারিদিকে অনুসন্ধান করিল—সত্যভামা নাই।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। নীলমেঘের উপরে পূর্ণচন্দ্র ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। পর্ব্বতের উপরে প্রাসাদ, প্রাসাদ শীর্ষ হইতে নিম্নে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে—জ্যোৎস্নামাখা তরুলতা চন্দ্রালোকে ঝিক্ মিক্ করিতেছে।

ভদ্রা সত্যভামাকে না পাইয়া প্রাসাদের ছাদে গিয়াছে। গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে ভদ্রার কোন চপলতা করিবার সামর্থ্য রহিল না। দেখিল সত্যভামা একান্তে উপবেশন করিয়া, চাঁদ পানে

চাহিয়া চাহিয়া যেন কাহার ধ্যান করিতেছেন। ভদ্রা নিঃশব্দে নিকটে গিয়া উপবেশন করিল। সত্যভামা পূর্ণচন্দ্রের দিকে চাহিয়া, আর ভদ্রা সত্যভামার মুখের দিকে তাকাইয়া। ভদ্রা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছে।

দেখিতেছে একখানা সর্ব্বব্যাপী ঘন নীল মেঘ। সত্যভামা যেন জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, সর্ব্ব অঙ্গ হইতে জ্যোতিচ্ছটা নিঃসৃত হইতেছে। ভদ্রা অজ্ঞাতসারে হস্ত প্রসারণ করিয়া ধীরে ধীরে চরণকমল স্পর্শ করিতেছে। রাজহংস যেমন নীল সরসী বক্ষে প্রস্ফুটিত কমলমালা ধীরে ধীরে স্পর্শ করে, ভদ্রা সেইরূপে সত্যভামার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিল। সেই সময়ে রৈবতকের প্রান্তভাগ হইতে অত্যুচ্চ উল্লাসধ্বনি উঠিল। সত্যভামা চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন ভদ্রা প্রণাম করিতেছে। সত্যভামা ভদ্রার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। বলিলেন 'ভদ্রা, এখনই আমাদিগকে দ্বারকায় ফিরিতে হইবে, নীচে রথ প্রস্তুত।'

ভদ্রা কতক্ষণ কিছুই বলিতে পারিল না, শেষে বলিল "দেখিয়া যাইবে না, ঐত রথের চূড়া দেখা যাইতেছে?"

"পরে দেখিস্" বলিতে বলিতে সত্যভামা ভদ্রার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভদ্রা বলিল "তোমারই না অসহ্য?"

সত্যভামা কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। ভদ্রার অলক্ষ্যে এক বিন্দু অশ্রু সত্যভামার নয়নতারকার কোলে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যভামা তাহা সম্বরণ করিলেন, মনে ভাবিলেন সে যে অন্তর্যামী।

তখন উভয়ে নীচে নামিলেন। প্রাসাদের দ্বারেই রথ প্রস্তুত ছিল। নিমেষ মধ্যে উভয়ে রথে আরোহণ করিলেন। বিদ্যুৎবেগে দ্বারকার পথেছুটিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বারকায় সমারোহ।

দ্বারকায় ভারি সমারোহ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন দ্বারকায় আসিতেছেন। সাত্যকি, উগ্রসেন, অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, পৃথু, বিপৃথু, উদ্ধব প্রভৃতি যদুবংশীয়েরা অগ্রবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুনকে আনিতে গিয়াছেন। কৃষ্ণার্জ্জুন এক রথে। রথ নারায়ণ মন্দিরের সমীপে উপস্থিত হইবা মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রথ হইতে অবতরণ করিলেন। উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন দেখিতে একরূপ। লোকে বিস্মিত হইয়া দেখিতেছে, নারায়ণের সজ্জার সহিত কৃষ্ণার্জ্জুনের বেশ-ভূষার কোন পার্থক্য নাই। উভয়ের বর্ণ নীলকান্ত মণির মত। উভয়েই কিরীট কুণ্ডলহারে সুসজ্জিত। যেন মন্দিরের মূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্ব সমক্ষে অর্জ্জুন রথ হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই বসুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মাতুলানীগণ অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য একত্র হইয়াছেন। কৃষ্ণ পরিচয় দিলেন, অর্জ্জুন একে একে সকলকে নম্রমুখে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। রুক্মিণী, জালহাসিনী, কালিন্দী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীগণ, এতদ্ভিন্ন অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণিবংশীয়া মহিলাগণ গবাক্ষ হইতে কৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন করিলেন।

স্থির হইয়া গেল নারায়ণ মন্দিরে অর্জ্জুন আপন তীর্থভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবেন। সত্যভামা পূর্ব্ব হইতে এই কথা উত্থাপন করিয়া সকলের আগ্রহ জাগাইয়াছেন। সত্যভামা অর্জ্জুনাগমনের

সঙ্গে আর একটী কার্য্য করিয়াছেন। সমস্ত দ্বারকা জুড়িয়া আজ মহাসমারোহ। সত্যভামা স্বহস্তে নারায়ণের অঙ্গরাগ করিয়াছেন। আজ সকলেই অর্জ্জুনের তীর্থভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবে।

দ্বারকায় নারায়ণের মন্দির শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কীর্ত্তি। মন্দির ও মন্দিরের দেবতা নিতান্ত বিস্ময়কর। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারি দিকে এক ক্রোশ জুড়িয়া এই মন্দির। সপ্তবাটিকা পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রত্যেক বাটিকার চারিধারেই সরোবর। অগাধ নির্ম্মল জলরাশি। কত কত নীলোৎপল, রক্তোৎপল, কহ্লার, কুমুদ সরোবরে ফুটিয়া আছে, কত হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক জলে খেলা করিতেছে। শত শত জলকুক্কুটরবে, শত শত ক্রৌঞ্চনাদে সরোবর উপনাদিত হইতেছে। সরোবরতটে প্রথম বাটিকার চারি দিকেই দেবালয়। নিম্নে রত্নময় বালুকারাশি সমন্তাৎ বিস্তৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার চারি দিকে কদম্বতরু। হরিতালবর্ণ অসংখ্য কদম্বপুষ্প সেখানে নিত্য বিকসিত। এই সমস্ত বৃক্ষে হরিতালবর্ণের বিহঙ্গমগণ নিরন্তর অস্ফুট ধ্বনি করিত।

দ্বিতীয় বাটিকায় পুষ্পবৃক্ষে চন্দ্র, শঙ্খ ও কুন্দবৎ শ্বেত পুষ্প বিরাজিত। তৃতীয়ে গোপকীট তুল্য রক্তপুষ্প। চতুর্থে পুষ্পরাজি মর্দ্দিত অঞ্জন ও ধূমের সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ। পঞ্চমে পুষ্পচয় বিশুদ্ধ সমুদ্রবারির ন্যায়। এই সমস্ত বাটিকায় কত মালতী, মল্লিকা, জাতি, নাগকেশর, বকুল, চম্পক, পারিজাত, স্থলপদ্ম নিত্য ফুটিত, আর ঐ সমস্ত বৃক্ষের সুগন্ধি কুসুম রাশির আমোদে দিঙ্মণ্ডল নিরন্তর সুরভীকৃত হইয়া থাকি ষষ্ঠ বটিকায় একটী মাত্র কল্পতরু। উহার চারি শা

প্রতিশাখায় সদ্যোজাত পুষ্প। ফুলে ফুলে ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ স্বরে গান করিত। কোকিল উন্মত্ত হইয়া কুহুরবে লোকের মন হরণ করিত। ঐ কল্পবৃক্ষের মূল দেশে মহামাণিক্য-বিনির্ম্মিত একটী মণ্ডপ। সেই মণ্ডপ মধ্যে মনোরম বেদী। পৃথিবী গর্ভ হইতে এই বেদী উত্থিত। বড় বড় মণি মাণিক্য দিয়া এই বেদী প্রস্তুত হইয়াছে। মণি মাণিক্যগুলি পদ্মের আকারে সংযোজিত। ছয়টী পদ্ম উপরে উপরে স্থাপিত। তিনটী পদ্ম দূর হইতে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত বলিয়া বোধ হয়, আর তিনটী মৃত্তিকার উপরে। প্রথম পদ্মটী শুদ্ধ স্ফটিকবৎ শুভ্রবর্ণ। দ্বিতীয়টী লোহিতবর্ণ। তৃতীয়টী স্ফটিকবৎ। চতুর্থটী মরকত-শ্যাম। পঞ্চমটী হরিদ্বর্ণ। ষষ্ঠটী শুভ্র, লোহিত, শ্যাম ও হরিদ্বর্ণ মিশ্রিত। এই অতি বৃহৎ ছয়টী পদ্মের আকারবিশিষ্ট বেদীর উপরে লক্ষ্মী নারায়ণের যুগল মূর্ত্তি। বেদী ও মূর্ত্তির রত্নপ্রভায় মণ্ডপ নিরন্তর জ্যোতি উদ্গীরণ করিতেছে।

প্রথম দর্শনে মূর্ত্তি লক্ষিত হয় না, শুদ্ধ নানা বর্ণের জ্যোতি চক্ষু ঝলসিয়া দিয়া যায়। বহুক্ষণ দর্শন করিতে করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, অনন্ত নাগ সহস্র ফণা তুলিয়া দণ্ডায়মান। প্রতি ফণার চক্ষু হইতে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ঐ সহস্র ফণা তলে নারায়ণ, বামভাগে লক্ষ্মী। মানবের ধ্যেয় সবিতৃমণ্ডলমধ্য-বর্ত্তী, সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট, কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটহারধারী হিরণ্ময়বপু নারায়ণ মূর্ত্তি যেমন সুন্দর, এ মূর্ত্তিও সেইরূপ। কিন্তু নারায়ণ মূর্ত্তি দূর হইতে হিরণ্ময় বোধ হইলেও এ মূর্ত্তি হিরণ্ময় নহে। এ মূর্ত্তি নীলোৎপলদলশ্যাম মূর্ত্তি। পরিধানে পীতবসন। কুঞ্চিত [illegible]কে কিরীট ঝলমল করিতেছে। স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিত জলজারুণ [illegible]স্ত সহস্রার্কপ্রতীকাশ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজিত, চন্দ্রকোটী

৫

সুশীতল, শ্রীবৎসহার-কেয়ূর-নূপুরাদি-বিভূষিত, এই নারায়ণ মূর্ত্তির বর্ণনা হয় না। লক্ষ্মী নারায়ণ উভয়ে উভয়কে অনুরাগে দর্শন করিতেছেন।

প্রথমে কেহই মুর্ত্তি দেখিতে পায় না, শুধুই জ্যোতি রাশি চক্ষে পড়ে। যেমন সমাধি ভিন্ন কূটস্থ মুর্ত্তি দর্শন হয় না, সেইরূপ একাগ্রদৃষ্টি ভিন্ন নয়নে নয়নাবদ্ধ লক্ষ্মী নারায়ণ দৃষ্টি গোচর হয় না। পরম শান্ত, পরম রমণীয় এই মূর্ত্তি আজ আরও সুন্দর হইয়াছে। সত্যভামা স্বহস্তে আজ নারায়ণের অঙ্গরাগ করিয়াছেন; আর ভদ্রা সুন্দর দুই ছড়া মালা লক্ষ্মী নারায়ণের গলদেশে দোলাইয়া দিয়াছে। উজ্জ্বল মূর্ত্তি নূতন অঙ্গরাগে জীবন্ত আকার ধারণ করিয়াছে, যেন কথা কহিবে।

আরও একটু বিশেষত্ব এই মূর্ত্তির আছে। নারায়ণের মূর্ত্তি সর্ব্বদা একরূপ হইলেও লক্ষ্মী মূর্ত্তি কি কৌশলে বলা যায় না ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিত, আর নারায়ণ একই থাকিয়াও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইতেন। লক্ষ্মী মূর্ত্তি প্রভাতে লোকে দেখিত বালিকা, মধ্যাহ্নে দেখিত যুবতী, আবার সায়াহ্নে দেখিত প্রৌঢ়া। প্রভাতে রক্তবর্ণ, মধ্যাহ্নে পীতবর্ণ, সায়াহ্নে স্ফটিকবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় এই মূর্ত্তি দর্শন করিতেন। দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দর্শনে মানবের মনে যেমন আনন্দ হয়, এই মূর্ত্তি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ যেন সেইরূপে আপনাকে আপনি আস্বাদন করিতেন। রুক্মিণী প্রভৃতি মহারাণীগণ আপন আপন সত্ত্বা যেন মূর্ত্তি মধ্যে সন্দর্শন করিতেন, আর স্পষ্ট বুঝিতেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই।

আজ সমস্ত দ্বারকায় ভারি একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। পঃ পথে জনতা, তাহার উপর রথ, অশ্ব, পদাতিক, গজ ইহাদের ভি ঐ রথ আসিল, ঐ বুঝি অশ্ব ঘাড়ে পড়িল, ঐ হস্তী সম্মুখে,

দিকে সবুর সবুর নিরন্তর এই শব্দ উঠিতেছে। দ্বারকার নরনারী অগ্রে গিয়া স্থান অধিকারে ব্যস্ত। চারি দিকে লোকে লোকারণ্য। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে দ্বারকাবাসীগণ একত্র হইয়াছে। নারায়ণের বিগ্রহ সমক্ষে উপযুক্ত আসনে বসুদেব। সম্মুখে অর্জ্জুন। চারিদিকে বিচিত্রাসনে দ্বারকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ। কৃষ্ণমাতাগণ ও কৃষ্ণমহিষীগণ নারায়ণের বামভাগে আবরণ অন্তরালে উপবেশন করিয়াছেন। সকলের সঙ্গে ভদ্রা, নিকটেই সত্যভামা। সেই সভায় শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন না।

"সব ত প্রস্তুত কিন্তু—"

"কি?"

"এই বর, কন্যা, ঘটকী, কন্যাযাত্রী, মন্দির, বিগ্রহ, প্রতিমূর্ত্তি এখন বিবাহটা দিতে"—

"৭ হরি এখনই"—

"তবে সভায় কথাটা আরম্ভ হইবে কিরূপে?"

"তুমিই বল"

"আমি বলি বসুদেব অর্জ্জুনকে দেখিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই!" জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বই কি। বসুদেব বারণাবতের জতুগৃহদাহের পর, কুন্তীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের পর ভার্গবকর্ম্মশালে শ্রীকৃষ্ণ পিতৃষসাকে এ সংবাদ দিয়াছিলেন। বসুদেব এখন অর্জ্জুনকে দেখিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আবার অর্জ্জুনের দ্বাদশ বার্ষিক ব্রহ্মচর্য্যের কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন। [বলি]লেন, 'যুধিষ্ঠির ইহা নিবারণ করিলেন না কেন? তুমিত ইচ্ছা [করি]য়া নারদের উপদেশ উল্লঙ্ঘন কর নাই?'

[স]ত্যভামা এই দ্বাদশ বার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য লইয়া পরে অর্জ্জুনের

সহিত বহু রঙ্গ করিয়াছিলেন। আমরা যথাস্থানে তাহা উল্লেখ করিব।

অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন 'আমি বনবাসে যাইব এই কথায় মহারাজ বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, আমাকে নিরস্ত করিতে কতই প্রয়াস পাইলেন।'

বসুদেব। কি বলিয়াছিলেন?

অর্জ্জুন। মহারাজ সকম্প গদ্‌গদ স্বরে বলিয়াছিলেন "তুমি ব্রাহ্মণের উপকারার্থে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাতে আমার ত অপ্রিয়ানুষ্ঠান করা হয় নাই। তবে তুমি আমার প্রাণে ব্যথা দিতে কেন প্রস্তুত হইয়াছ? বিশেষ সপত্নীক জ্যেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করাতে কনিষ্ঠের কোন পাপ নাই।" রাজা আমার মস্তক আঘ্রাণ করিতে করিতে বালকের মত রোদন করিলেন, শেষে বলিলেন 'অর্জ্জুন! তুমি বনে যাইও না, ইহাতে তোমার ধর্ম্ম লোপ হইবে না। তুমি যাহা করিয়াছ, ইহাতে আমার অণুমাত্র অবমাননা হয় নাই।"

সত্যভামা পরে এই সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—দ্রৌপদী কি করিলেন?

অর্জ্জুন উত্তর করিয়াছিলেন—দ্রৌপদী মহারাজের সমক্ষে কোন কথাই কহিতে পারেন নাই। কেবল ইঙ্গিতে ইহাই প্রকাশিত হইয়াছিল যেন আমি একবার তাহার সহিত দেখা করি। আমি দেখা করিলাম। দ্রৌপদী বড়ই কাঁদিয়াছিল, বড়ই আত্মনিন্দা করিয়াছিল।

সত্যভামা সব শুনিয়া বলিলেন "হুঁ"।

যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বসুদেব অভি[illegible] হইয়াছিলেন, শেষে বলিলেন অর্জ্জুন! তুমি অগ্রজের [illegible]খা

উপেক্ষা করিলে কেন? আহা যুধিষ্ঠিরের মত ভ্রাতা আর কোথায়? তুমি তাঁহার মনে ব্যথা দিয়াছ কেন?

অর্জ্জুন। মহারাজ! অমি তাঁহারই নিকটে শিক্ষা পাইয়াছি ছল পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। আমি তাঁহারই নিকটে আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলাম কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না। আমি জানি যুধিষ্ঠির দয়ার মূর্ত্তি কিন্তু সত্য প্রতিপালন করিতে হইলে নির্ম্মম হইতে হয়।

বসুদেব। সত্যই

অর্জ্জুন। অগ্রজের হৃদয় বুঝিয়া আমার প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম মহারাজ স্নেহের বশীভূত হইয়া আমায় নিবারণ করিতেছেন। আমি রাজাকে প্রবোধ দিয়া বলিলাম "বনবাসে আমার কোন ক্লেশ হইবে না। আর দ্বাদশ বৎসর দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইবে। বিশেষ আপনি আমার সংবাদও পাইবেন। আমি আপনারই ভৃত্য। আপনি সত্যমূর্ত্তি। আমায় অনুমতি করুন, আমি সত্য পালন করিয়া কৃতার্থ হই।"

বসুদেব বালক অর্জ্জুনের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া বহু প্রশংসা করিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন দ্বাদশ বর্ষের আর বাকি কত?

অর্জ্জুন। এই দশম বৎসর।

বসুদেব। এই দশ বৎসর তুমি তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিতেছ! অর্জ্জুন! তুমিই ধন্য। এই মুহূর্ত্তে বহু সভাসদ সহসা দণ্ডায়মান হইল, কর যোড়ে মুহুর্ম্মুহু প্রণাম করিতে লাগিল। অর্জ্জুন বিস্ময়ে দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন।

মেঘ উঠিলে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে, বলাকশ্রেণী দলবদ্ধ হইয়া মেঘের কোলে উড়িয়া বেড়ায়, তরুলতা শির দোলাইয়া কি যেন আহ্বান করে, বালক বালিকা আনন্দে চঞ্চল হয়, আর যথাসময়ে মেঘ দেখিয়া কৃষক বড় উৎফুল্ল হইয়া তাকাইয়া থাকে। কৃষ্ণ আগমনে সেই সভাস্থলে বহুভাবের খেলা হইল। বসুদেব, রোহিণী, দেবকী, স্নেহরসে আর্দ্র হইলেন, রুক্মিণী, সত্যভামার চক্ষু যেন সন্ধানপূরিত হইল, ভদ্রার চক্ষে জল আসিল, বীর-হৃদয় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, অর্জ্জুন যেন কি এক অপূর্ব্ববলে সমুৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই নারায়ণকে প্রণাম করিয়া বসুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সভাস্থ সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া অর্জ্জুনের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

সভার বড় শোভা হইল। অর্জ্জুন আপন হৃদয়ে কত কি অনুভব করিলেন। অর্জ্জুন অতি অপূর্ব্ব ভাবে আপন তীর্থ-ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। যেথানে যাহা সুন্দর দেখিয়াছেন, রমণীয় বিচিত্র কানন, সরোবর, নদী, সাগর, বিবিধ দেশ, পবিত্র তীর্থ। সকলে অর্জ্জুনের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে যেন সেই সেই স্থান দর্শন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদ্বারে উলুপী সংবাদ, সৌভদ্রা তীর্থে বা নারীতীর্থে পঞ্চ অপ্সরাবৃত্তান্ত, মণিপুরে চিত্রাঙ্গদা-পরিণয়, নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠ পর্ব্বত, ভৃগুতুঙ্গ, হিরণ্যবিন্দুতীর্থ, মহেন্দ্র পর্ব্বত, অর্জ্জুন মুখে এই সমস্ত তীর্থ বিবরণ শ্রবণ করিতে করিতে সকলে আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন মধ্যে কি যেন দেখিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা অভিভূত হইতেছিল ভদ্রা। ভদ্রার চক্ষে পলক নাই, নাসিকায় শ্বাস রুদ্ধ। ঠিক বলা যায় না ভদ্রা দেখিতেছিল, কি

শুনিতেছিল। বুঝি শুনিতে শুনিতে সব ভুলিয়া রূপসাগরে ডুবিয়াছিল। কৃষ্ণের সম্মুখে অর্জ্জুনকে দেখিতে দেখিতে ভদ্রা কি যেন একটা ভুল করিল, কি যেন কি হারাইয়া গেল, কি যেন কি মিলাইয়া লইল। সত্যভামা নিকটেই বসিয়াছিলেন, কাণের কাছে মুখ আনিয়া কি বলিলেন। ভদ্রা শিহরিয়া উঠিল, সেই সময়ে কৃষ্ণ সভাভঙ্গ করিলেন। সকলেই জানিল কল্য সমস্ত দ্বারকাবাসী রৈবতকে উৎসব দেখিতে যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

রৈবতকে মহোৎসব।

দ্রাংদ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত
মধুর মন্দির রসাল রে।
শঙ্খকরতাল, ঘণ্টারব ভেল
মিলন পদতলে তাল রে॥ (গোবিন্দ দাস)

দ্বারকাবাসী প্রায় সকলেই রৈবতকে আসিয়াছেন। নানা-স্থান হইতে আরও কত লোক আসিতেছে। রৈবতকে মহোৎ-সব। কৃষ্ণার্জ্জুন সর্ব্বাগ্রে।

দ্বারকাবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রৈবতকে উৎসব দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ স্বভাব-সুন্দর রৈবতক বড় সুন্দর সাজিয়াছে। বহু প্রকাশ্য স্থান নৃত্যগীতবাদ্যোদ্যমে ঝঙ্কারিত হইতেছে। বহুগুপ্তস্থান লতাবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে। বহু বৃক্ষ নানা রত্নের সাজ পরিয়াছে। বহু বৃক্ষশাখে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত পতাকা উড়িতেছে। স্থানে স্থানে উদ্যান, স্থানে স্থানে চন্দ্রাতপ, চারিধারে প্রবাল মুক্তাঝারা। দাস দাসী শ্বেত কৃষ্ণ চামর লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। রৈবতক সন্নিহিত প্রদেশ সকল রত্নমণ্ডিত অট্টালিকাবলী ও কল্পপাদপে মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। বহুস্থানে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয়ের প্রচুর আয়োজন। নিম্নে সাগরবক্ষে জলক্রীড়ার জন্য নানাবিধ তরণী। সর্ব্বস্থানেই নৃত্য, গীত বাদ্যের স্রোত চলিয়াছে।

যদুবংশীয় কুমারেরা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুবর্ণ যানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। শত সহস্র পুরবাসী পুত্র-কলত্র সঙ্গে পাদচারে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই উৎসবে রোহিণী

দৈবকী প্রভৃতি কৃষ্ণমাতাগণ আগমন করিয়াছেন। বলদেব মহিষী রেবতী, রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজীতি, জালহাসিনী, কালিন্দী, জাম্ববতী, পৌরবী, সুভামা প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীগণ উপস্থিত হইয়াছেন। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, চারুবিন্দ, চারুমতি, শাম্ব, মিত্রবান, মিত্রবতী, সত্যজিত, সেনজিত প্রভৃতি কুমার কুমারীগণ; অক্রুর, উদ্ধব, সাত্যকী, উগ্রসেন, বসুদেব প্রভৃতি যাদবগণ সকলেই সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় এ উৎসব। এ উৎসব বর্ণনা করা অসাধ্য।

উৎসব আরম্ভেই জগৎবিখ্যাত এক নট সভাস্থলে উপনীত হইল। নটের বেশ বিন্যাস জন্য যাদব যাদবীগণ রাশি রাশি রত্ন প্রদান করিলেন। নট রঙ্গভূমিতে নৃত্য আরম্ভ করিলে পুরবাসীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। নৃত্যের পরে মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বনে নাটক আরম্ভ হইল। রাক্ষসেন্দ্র দশগ্রীবের বিনাশ জন্য নারায়ণের জন্ম গ্রহণ, এই অভিনেতব্য বিষয় সূচিত হইল। লোমপাদ, দশরথ, বশিষ্ঠ, শান্তা, বারাঙ্গনা সহ ঋষ্যশৃঙ্গ, রামলক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকয়ী, সীতা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি বেশধারী নটগণ রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইল।

কোন স্থানে অন্যবিধ নৃত্য হইতে লাগিল। বেণু, মুরজ, আনক এবং তন্ত্রীবদ্ধ বীণা সকল বাদিত হইতে লাগিল। কোথাও বা বারাঙ্গনাগণ দেব, গান্ধার, ছালিক্য প্রভৃতি সঙ্গীত আলাপ করিতে লাগিল।

এক স্থানে গঙ্গাবতরণ নামক সঙ্গীত আলাপ হইতেছিল। বড় ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠে এই গায়ক হিমবিধূমুক্তা ধবলতরঙ্গা, মনোহারিণী গঙ্গার অবতরণ গান করিতেছিল। গায়ক ঊর্দ্ধে

হাত তুলিয়া করুণার্দ্র কণ্ঠে স্তুতি করিতে করিতে দেখাইতেছে, ঐ দেখুন দেব মহর্ষি উরগ ও যক্ষগণ, গঙ্গা গগনপ্রচ্যুত হইতেছেন জানিয়া সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে দর্শন করিতেছেন। এক দিকে মহারাজ ভগীরথ, দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্যানুসারে প্রণতিপূর্ব্বক চিত্তে গঙ্গাকে ধ্যান করিতেছিলেন, অন্য দিকে পবিত্রতোয়া, পরম রমণীয়া গঙ্গা ভগীরথ ধ্যান করিতেছেন এবং গঙ্গাধরও উপস্থিত আছেন অবলোকন করিয়া সহসা গগন হইতে বিচ্যুত হইলেন। তখন মহাবর্ত্তযুক্তা, মীনগ্রাহ প্রভৃতি জলজন্তুসঙ্কুলা, তরলতরঙ্গা, ত্রৈলোক্যনমিতা জহ্নুসুতা গগন হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। শূলপাণি স্বর্গ-নিপতিতা গগনমেখলা গঙ্গাকে মুক্তাময়ী মালার ন্যায় ললাটদেশে ধারণ করিলেন।

পরে হরজটাজূটাটবীচারিণী, হরি-পাদপদ্ম তরঙ্গিণী, ত্রিভুবনতারিণী. ত্রিপথগামিনী, জনপাবনা, সরিদ্বরা আকাশগঙ্গা মহাদেব কর্ত্তৃক ত্যক্তা হইলে প্রথমে সপ্ত ধারায় সুশোভিতা হইলেন। হ্লাদিনী, পাবনী, ও নলিনী নামে তিনটী শিবজলা শুভধারা পূর্ব্বদিক বাহিয়া চলিল। সুচক্ষ, সীতা, ও মহানদী নামক তিনটী শুভসলিলধারিণী ধারা পশ্চিম দিকে ছুটিল, আর তাঁহার সপ্তম ধারাটী ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তদীয় নির্ম্মল নীরে ফেণপুঞ্জ ব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন মরালকুল কেলি করিতেছে। ফেণ-পটল-সংবৃতাঙ্গী সুরনদী হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নিপতিত হইয়া পন্নগবধূর ন্যায় কোন স্থলে শিলাতলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, কোথাও বা কুটিল গতিতে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়াছেন, কোন স্থানে বা স্খলিত হইয়া প্রমত্তা প্রমদার ন্যায় গমন করিতেছেন। কোন স্থানে বা তোয়শব্দ দ্বারা মধুর ধ্বনি

করিতেছেন। গায়ক নিজে অভিভূত হইয়া যখন এই ঝঙ্কার-কারী শুভকারী বারির কথা বলিতেছিল, কবির কথায় সে ভাব প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়।

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তি হরশিরসিজটাবল্লিমুল্লাসয়ন্তী
স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী।
ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূং নির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী
পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগর সুহৃদ্ পাবনী নঃ পুনাতু॥

তখন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে এমন কেহই ছিলনা, যাঁহার প্রাণে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ না ছুটিতেছিল। এই গায়ক উন্মত্ত হইয়া কখন বা নানাভঙ্গে অঙ্গ দোলাইয়া গাহিতেছিল—

শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী
পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণীসমুৎসারিণী।
শেষাঙ্গে রণুকারিণী হরশিরোবল্লীদলাকারিণী
কাশীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী॥

মহাদেবের সঙ্গীতে মুরারিচরণচ্যুত গঙ্গাবারির ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে অবস্থান, হরজটা মধ্যে বিচরণ, পরে হিমালয় হইতে স্খলন, গায়ক কলুষবিনাশিনী পতিতোদ্ধারিণী, জাহ্নবীর বড় বর্ণনা করিতেছিল।

রৈবতকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান এইটী। এই নির্ঝরিণী কুঞ্জ পর্ব্বতের নিম্নে প্রতিষ্ঠিত। দুই দিক হইতে দুই নদী কুল্ কুল্ করিয়া নির্ঝারিণী কুঞ্জ সমীপে হ্রদে প্রবেশ করিতেছে। স্থানের গুণে গঙ্গাবতরণ বড় মধুর লাগিতেছিল।

সহচরী সঙ্গে ভদ্রা এখানে উপস্থিত। সত্যভামা রুক্মিণী এখানে আসিয়াছেন। রোহিণী দেবকী বড় আনন্দে এই

অভিনয় দেখিতেছিলেন। গায়ক যখন বলিতেছিল "ক্বচিৎ পদ্মিনী রেণুভঙ্গপ্রসঙ্গে, মনঃ খেলতাং জহ্নুকন্যা প্রসঙ্গে"—

যখন এইরূপ একটা ভাষায় যেন বলিতেছিল—

"ভগবতি! তবতীরে নীরমাত্রাশনোঽহং
মুদিতহৃদয়কুঞ্জে নন্দসূনুং ভজেঽহম্"।

তখন বড়ই অদ্ভুত হইল। অর্জ্জুন সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া নট পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল "কৃষ্ণমারাধয়ামি" সকলে অবাক হইয়া দেখিল নট ক্রন্দন করিতেছে। অর্জ্জুন ভক্তের অবস্থা দেখিয়া বড়ই অভিভূত হইতেছিলেন। একে এই রমণীয় স্থান তাহার উপর এই মধুর ভক্তিভাব, অভিভূত হইবারই কথা।

সহসা অর্জ্জুন সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। ষোলকলায়পূর্ণ একখানা চাঁদ যেন সেই উৎসব সমাজে উদিত হইয়াছে। অর্জ্জুন কৃষ্ণের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। আশ্চর্য্য! সাবধান হইতে না হইতেই চাঁদ অন্তরাকাশে ঝলমল করিয়া উঠিল। অর্জ্জুন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সর্ব্বলঙ্কারভূষিতা, সখীজনপরিবৃতা, কুমারীকে দর্শন করিয়া কিছু অন্যমনস্ক হইয়াছেন, এক পলকের মধ্যে জ্বলন্ত রূপরাশি ভিতরে নৃত্য করিতেছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে অর্জ্জুন ভিতরে দেখিতেছেন, রুক্ষ সুচাঁচর-কবরীভারপরিবেষ্টিত সহাস্য মুখকমল বায়ুতাড়িত মেঘমালা মধ্যে চাঁদের মত ভাসিয়া চলিয়াছে; শ্রুতিমূলে সুন্দর কুণ্ডল, দুই গণ্ড ঝল্‌মল্‌ করিতেছে; নাসাগ্রে গজমতি আকাশে শুকতারার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছে; আর সেই দৃষ্টি—আঁখি যেন কত কথা কহিতে চায় অথচ পারে না বলিয়া বড় প্রশান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই সময়ে

গঙ্গাবতরণ সঙ্গীত ভঙ্গ হইল। নট ও দর্শকবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। কৃষ্ণমাতাগণ ও রেবতী, এবং কৃষ্ণমহিষীগণ প্রাসাদ অভিমুখে চলিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত লতাকুঞ্জের বহির্দ্বার দিয়া পর্ব্বতের বাহিরে আসিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে একান্তমনা দেখিয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে! বনচর হইয়াও চিত্তকে প্রশ্রয় দিতেছ?

অর্জ্জুন লজ্জিত হইয়াছেন। নিমেষ মধ্যে মনে হইল, তিরস্কৃত হইয়া চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু আসক্তির বস্তু সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে ইচ্ছা করাও চিত্তজয় নহে, ইহাও চিত্তের কৌশল। অর্জ্জুন জানিয়া শুনিয়াও প্রশ্ন করিলেন, সখে! দেখিতেছি এ কন্যা অনূঢ়া—

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের হৃদয়গত ভাব বুঝিলেন। সুভদ্রার পরিচয় দিলেন, বলিলেন ইনি বসুদেবের কন্যা, সারণের সহোদরা, এবং আমারই ভগিনী। ইঁহার নাম সুভদ্রা। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন ইঁহার উপযুক্ত বর মিলিতেছে না তাই অবিবাহিতা।

অর্জ্জুন ব্রহ্মচারী। সহসা বনচর্য্যার কারণ মনে পড়িল, হৃদয়মধ্যে একটা কোলাহল উঠিল। অর্জ্জুন যেন ভিতরে আর কিছু অনুভব করিলেন, বাহিরে লজ্জা আসিয়া মুখ আবরণ করিল।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সুভদ্রার স্বয়ম্বর হয় ইহাই পিতার ইচ্ছা। স্বয়ম্বরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রকৃতির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে, স্বয়ম্বরে যে ভদ্রা কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে কে বলিতে পারে। আমি কল্য দ্বারকায় সুভদ্রার বিবাহ কথা পিতার নিকট উত্থাপন করিব।

অষ্টম অধ্যায়।

রঙ্গ।

প্রকৃতি সাজে, কিন্তু কাহার জন্য ? ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতি নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করে। সুন্দর নীল আকাশে কত রঙ্গে মেঘের খেলা হয়, প্রভাতে নূতন নূতন ফুল ফুটাইয়া, মৃদুল মলয় তুলিয়া, বিহগ কাকলীতে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া, প্রকৃতি কাহার তৃপ্তি সাধন করে ? সমুদ্রে তরঙ্গ ভঙ্গের খেলা কি কাহাকেও দেখাইতে ? আবার প্রকৃতি কখন বড় গম্ভীর ভাব ধারণ করে, মধ্যাহ্নে কখন কখন শ্বাস প্রশ্বাস ধারণ করে, সায়াহ্নে যখন কোটী কোটী তারকা ফুটাইয়া আপনার সৌন্দর্য্য আপনি দেখে, তখন ইহা কি এক অপূর্ব্ব শান্ত ভাব ধারণ করে! প্রকৃতির এই চাঞ্চল্য এই গাম্ভীর্য্য কাহার জন্য ? প্রকৃতির আনন্দোচ্ছ্বাসের কি কোন কারণ আছে? কোন্ অজ্ঞাত কারণে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় বলা যায় না।

আজ রাত্রিতে দ্বারকাবাসীগণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ভদ্রা আজ বড়ই রঙ্গময়ী। বেশভূষার পারিপাট্য নাই, কেশরাশি আলু থালু, অঙ্গের দুকূল বিশৃঙ্খল। ভদ্রা সত্যভামার সহিত কখন রহস্য করিতেছে, কেন ভদ্রার এ আনন্দোচ্ছ্বাস ? ভদ্রা বলিতেছে "যাবার বেলা একটু রঙ্গ করিয়া যাইব।" সত্যভামা বলিলেন "রঙ্গ লইয়া যাইবে না ত ?" ভদ্রা বলিল "তোমার জন্য"। ভদ্রা এই বলিতে বলিতে রৈবতক-শিখরোদ্দেশে ছুটিল। পূর্ব্ব হইতে দুই চারি দাসীর উপর আলোক সাজাইবার ভার ছিল। ভদ্রা উপরে উঠিয়া আলোকমালা সাজাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতের শুষ্ক কাষ্ঠ তৃণ লতাদিতে অগ্নি ধরাইল। পর্ব্বতে অগ্নি

জ্বালিয়া উঠিল, দ্বারকাবাসী সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল। রৈবতকের বড়ই শোভা হইয়াছে।

দিবসের প্রথমভাগে গঙ্গাবতরণ শেষ হইয়াছিল এখন সন্ধ্যা, অর্জ্জুন একাকী রৈবতক প্রান্তে। সম্মুখে বনভূমি। সন্ধ্যা আসিল, বনভূমি শ্যামবর্ণ ধারণ করিল, অর্জ্জুন গৃহাভিমুখে ফিরিয়াছেন, সহসা দেখিলেন রৈবতকশিখরে অগ্নি জ্বলিতেছে। পর্ব্বতে অগ্নি লাগিয়াছে প্রথমে বোধ হইল। অর্জ্জুন পর্ব্বত শৃঙ্গে আলোকমালা দেখিলেন মনে হইল কে যেন দীপালোকে পর্ব্বত গাত্র সাজাইয়াছে। দেওয়ালীতে গৃহে গৃহে আলোকমালা যেমন দেখায়, অর্জ্জুন দূর হইতে পর্ব্বত-অঙ্গে সেইরূপ আলোকমালা দেখিতে দেখিতে আসিতেছেন। বায়ুবশে আলোক কখন নির্ব্বাণপ্রায় হইতেছে আবার পরক্ষণেই উজ্জ্বল দেখাইতেছে। অর্জ্জুনের মনে হইল যেন আলোকমালার পশ্চাতে কোন ছায়া-মূর্ত্তি সঞ্চরণ করিতেছে।

অর্জ্জুন দ্রুতপদে পর্ব্বতশিখরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগি-লেন। শৃঙ্গ পর্য্যন্ত উঠিবার পথ ছিল। অর্জ্জুন পর্ব্বতের পশ্চাতে আসিয়াছেন কিন্তু কোন মূর্ত্তি লক্ষ্য হইল না। অর্জ্জুন ভ্রমণ করিতে করিতে শিখরের উপরে আসিলেন। পর্ব্বতের সম্মুখ-ভাগে আলোকমালা, কিন্তু পশ্চাতে আলোক আঁধার খেলা করিতেছে। অর্জ্জুন যেন সেই আলোক আঁধারে কোন ছায়া-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন মূর্ত্তি সম্মুখে। জিজ্ঞাসিলেন—কে?

সেই সময়ে আলোকমালা সহসা উজ্জ্বল হইল, সেই প্রদীপ্ত আলোকরাশি মধ্যে একটী কানকীলতা, আর একটী নবীন জলধর। অর্জ্জুন ও ভদ্রা উভয়ে উভয়কে দেখিয়া বিস্মিত হই-

লেন, চারি চক্ষের মিলন হইল; ভদ্রার কর্ণে 'কে' কথা ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন ভদ্রাকে দর্শন করিবামাত্র পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। ভদ্রার হস্তের প্রদীপ হস্তচ্যুত হইল, ভদ্রা অজ্ঞাতসারে কনক প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কর্ণে 'কে' কথা পুনঃ পুনঃ ঝঙ্কার তুলিতেছে।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল ভদ্রার মনে নাই, যখন বহির্দৃষ্টি প্রসারিত হইল তখন দেখিল এক দূতি। সত্যভামা দূতি পাঠাইয়াছেন, অপরাহ্নে ভদ্রা যে রঙ্গ করিবে বলিয়াছিল, সর্ব্ব সমক্ষে তাহার অভিনয় হইল; কিন্তু কেহই জানিল না, এ খেলা কাহার? কেবল জানিতেন সত্যভামা ও দুই চারি দাসী। খেলা সাঙ্গ করিয়া ভদ্রাকে লইয়া যাইবার জন্য দূতি আসিয়াছিল। খেলা আপনি সাঙ্গ হইল, ভদ্রা দূতি সঙ্গে নীচে আসিল।

সেই রাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসীর সঙ্গে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনও আসিলেন। রৈবতক উৎসব ক্রমে সাঙ্গ হইল।

নবম অধ্যায়।

দূতি।

অনুরাগ কোন্ বস্তু ?

ইহা স্বর্গের সুধা, মর্ত্ত্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ, ইহার পরিপাক জানিলে ইহাই ব্রহ্মানন্দ, না জানিলে ইহা কালকূট। অনুরাগ হইতে আত্মসুখ কামনা দূর করাই প্রকৃত দূতির কার্য্য। ভদ্রার দূতি সত্যভামা। কিছু অপূর্ব্ব বটে।

দ্বারকার নিকটেই রৈবতক। সময়ে সময়ে স্ত্রীলোকেরা মহাগিরি প্রদক্ষিণ ও দেবতা অর্চ্চন জন্য রৈবতকে গমন করিতেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে দ্বারকায় আসিলেন। অন্তঃপুরেই অর্জ্জুনের শয়ন কক্ষ, এই প্রাসাদ সত্যভামার প্রাসাদসংলগ্ন। সম্মুখে সুভদ্রার শয়নমন্দির।

অর্জ্জুনের শয়ন কক্ষে নানাবর্ণের চিত্রাঙ্কিত কোমল গালিচা। কৃষ্ণার্জ্জুন নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছেন। সত্যভামা আপনার গৃহে। আজ ভদ্রা নিকটে নাই। সত্যভামা ভদ্রার শেষ সংবাদ জানিতেন না। "ভদ্রা আজ আসিল না" চকিতে যেন সত্যভামা কি দেখিলেন। সত্যভামা ভদ্রার উদ্দেশে বাহির হইলেন।

শরতের রাত্রি বড় নির্ম্মল। নির্ম্মল আকাশে নির্ম্মল চাঁদ ভাসিয়া ভাসিয়া ছুটিয়াছে। কখন মেঘের আড়ালে নির্ম্মল মুখ ঢাকিতেছে, আর দূরে আকাশের গায়ে তারারাজি ঝিক্ মিক্ করিয়া হাসিতেছে। সত্যভামা আকাশের দিকে চাহিলেন। মেঘের আড়াল হইতে চাঁদ যেন হাসিতে হাসিতে বাহির হইল,

সত্যভামা নিঃশব্দে ভদ্রার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ভদ্রা কোথায়?

রৈবতক হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রা আপন শয্যায় কতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। শয্যা কি কণ্টকাকীর্ণ? শয্যা ভাল লাগিল না। ভদ্রা উঠিল, উঠিয়া ছাদে গিয়া বসিল। ছাদ চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। উপর খোলা। আজ ত কিছুই ভাল লাগে না, আজ সত্যভামার কথাও ত মনে পড়ে না। ভদ্রা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পাদচারণ করিল, হৃদয় যেন কি দেখিতে ব্যাকুল; সহসা সত্যভামার প্রাসাদসংলগ্ন গৃহের দিকে দৃষ্টি পড়িল। প্রাসাদের পূর্ব্ব দিকে ভদ্রার গৃহ। ছাদের পূর্ব্বধারে একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন। বাতায়নে দেহ লুকাইয়া ভদ্রা দেখিতেছে অর্জ্জুনের গৃহে দীপ জ্বলিতেছে। আবার সেই আলোকমালা, আর আলোকরাশির মধ্যে সেই জ্যোতিরভ্যন্তরে অচিন্ত্য শ্যামমূর্ত্তি। ভদ্রা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অল্প দীপালোকে সেই মূর্ত্তির ছায়া পানে দৃষ্টি পড়িল। চক্ষু আর অন্য দিকে ফিরে না। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, ভদ্রা যে স্থানে দাঁড়াইয়াছে সে স্থান হইতে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। মরি মরি কি সুন্দর মূর্ত্তি, কি সুন্দর অঙ্গভঙ্গী। ভদ্রা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। জগৎ সংসার আজ ভদ্রার নিকট লুপ্ত।

সত্যভামা বহুক্ষণ ধরিয়া ভদ্রার অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন, নিজ জীবনের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। প্রাণে আনন্দ খেলা করিল। সত্যভামা পার্শ্বে আসিয়া ডাকিলেন "ভদ্রা"!

চোর চুরি করিতেছে, সহসা অন্য লোকের শব্দ শুনিয়া যেমন চমকিয়া উঠে, ভদ্রা সেইরূপ চমকিয়া উঠিল। বুকের ভিতর কিসের পাট পাড়িল; ভদ্রা ব্যস্ত সমস্তে বলিল "তুমি"! ভিতরে

সেই "কে" ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ভদ্রা বলিল 'সখি! কখন ত এমন হয় নাই, তোমার নিকটে যাইতেও মনে ছিল না।'

সত্যভামা ভদ্রার হাত ধরিলেন। স্পর্শ বড় মধুর লাগিল। সত্যভামা বুঝিলেন ভদ্রার হৃদয়ে প্রবল অনুরাগ জাগিয়াছে। তবে আর০ কিছু কি হইয়াছিল? সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভদ্রা যেন বলিবার চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছে না। একথা বুঝি বলা হয় না।

শেষে সত্যভামা ভালবাসার কথা পাড়িলেন। আপন জীবনের নবানুরাগের কথা কহিলেন। ভদ্রা সকল কথা বলিয়া ফেলিল। জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্যাম সুন্দর মূর্ত্তির কথা বলিতে বলিতে ভদ্রা কাঁদিয়া ফেলিল। শেষে বলিল 'সখি! আমার এ কি হইল? আমি যে আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারি না।'

ভদ্রার সরলতায় সত্যভামা ভিতরে যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিতেছেন, কিন্তু বাহিরে কপট তিরস্কার করিলেন। সত্যভামা দূতি।

রাধাকৃষ্ণের মিলন ব্যাপারে দূতির কার্য্য বড় সুন্দর। অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য দূতি আবশ্যক। অনুরাগ হইতে কামভাব বিগলিত করা দূতির কার্য্য। আত্ম সুখের ইচ্ছাই কাম, কৃষ্ণসুখেচ্ছাই প্রেম।

অনুরাগ কাহার না জন্মে? বিবাহকালে যুবকের অনুরাগ কে না দেখিয়াছে? নববধূর অনুরাগ কাহার চক্ষে না পড়ে? কিন্তু এ অনুরাগ স্থায়ী হয় না কেন? অনুরাগের কামভাব যখন দূরীভূত না হয়, তখন কামই প্রেমকে গ্রাস করে।

অনুরাগ স্বর্গীয় বস্তু। পৃথিবীর রক্ত মাংসের মধ্যে খেলা করে বলিয়া ইহাতে ময়লামাটী লাগে; এ ময়লামাটী, এ

পশুভাব সহজেই দূর করা যায়। পশুত্ব অনুরাগের ধর্ম্ম নহে, বরং পশুত্ব দেখিলে অনুরাগ পলায়ন করে ; পশুত্ব প্রক্ষালন করিতে পারিলে অনুরাগ "অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল"। এই অনুরাগ পশুত্বপ্রক্ষালিত হইয়া ভক্তি প্রেম ইত্যাদি চিত্তচমৎকৃতিতে পরিণত হয়। ভক্তি! ভক্তি মহারাণী। পুষ্পের সুকোমল সৌগন্ধ শয্যা যাঁর শয়ন স্থান, তিনি কি কখন আমিষ শয্যায় শয়ন করিতে পারেন? মহারাণী কি কখন পশুত্ব সহ্য করিতে পারেন?

হরি হরি কাম ও প্রেম কতই অন্তর। ভক্ত বলেন "কামে চৈতন্যের হরণ, প্রেমে চৈতন্যের বিকাশ। কামে ক্ষুদ্র আমির তৃপ্তি, প্রেমে ক্ষুদ্র আমির বিনাশ। কামে বিষয়তৃষ্ণা, প্রেমে বিষয়ভুল। কামে দেহাত্মা চিন্তা, প্রেমে আত্ম সমর্পণ। কাম আপনা লইয়া, প্রেম আপনা ভুলিয়া।"

অনুরাগ যায় কেন? যেখানে পশুত্ব সংযমিত সেখানেও ত অনুরাগ মন্দীভূত হইতে দেখা যায়। কারণ আছে—অনুরাগের প্রাণ সেবা, সেবাশূন্য অনুরাগ অল্পে অল্পে বিকার প্রাপ্ত হয়। স্থূলসেবায় দেহের তৃপ্তি, কিন্তু সৎসঙ্গরূপ সেবায় মনের নিবৃত্তি ঘটে। অনুরাগীর হৃদয়ে যত দিন না ইহা বদ্ধমূল হয়, যে আমি ভিন্ন তাহার যেন কিছু অসম্পূর্ণ থাকে, আমি ভিন্ন তাহার যেন সেবার ক্রটী হয় আমি না থাকিলে তার যেন কিছু ক্লেশ হয়, সে আমার জন্য কষ্ট পায়, তত দিন অনুরাগের স্থায়িত্ব নাই। যে মুহূর্ত্তে মনে হয় আমি না হইলে তাহার চলে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে অনুরাগ ধীরে ধীরে অন্যরূপ হইতে থাকে।

অনুরাগের প্রথম অবস্থায় দেখিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেই, ইহা আত্ম সুখেচ্ছা, ইহা কাম। কিন্তু সেবা করিতে করিতে

যখন মনে হইবে আমার সেবা আমার প্রিয়জন গ্রহণ করিয়াছেন, আমার সেবায় তাঁর বড়ই সন্তোষ হয়, আমার সেবা না হইলে তাঁহার ক্লেশ হয়, তখন প্রিয় জনের চিন্তা সর্ব্বদাই থাকে; এই চিন্তা গাঢ় হইলেই ধ্যান হয়, ধ্যানের শেষ অবস্থায় বস্তুর স্বরূপ দর্শন হইবেই।

রাধাকৃষ্ণ লীলায় দূতি যখন কৃষ্ণের নিকটে তখন তিনি রাধার যন্ত্রণা বর্ণনা করেন, আবার যখন রাধার নিকটে তখন কৃষ্ণের বিরহ বর্ণনা করেন; ইহাতে রাধা কৃষ্ণ পরস্পরের সুখেচ্ছা করেন। আত্মসুখেচ্ছা প্রিয়ের সুখেচ্ছায় পরিণত করিতে হয় ইহাই রাধা কৃষ্ণ লীলার লৌকিক শিক্ষা।

সত্যভামা আজ দূতি। দূতির প্রথম কার্য্য অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে শেষ হইয়াছে। সত্যভামা জানিয়াছেন অনুরাগের বেগ কতটুকু। আপনা হইতে আজ তিরস্কার আসিতেছে। ইহাতে সত্যভামার কোন ইচ্ছা বা মতলব নাই, সত্যভামার যেন ইহা স্বভাব হইয়া গিয়াছে; আপনি অনুরাগে সিদ্ধ, যাহা কিছু তিনি করেন তাহাই অনুরাগবৃদ্ধির জন্য হইয়া যায়।

সত্যভামা ভদ্রাকে বড় তিরস্কার করিলেন; বলিলেন ভদ্রা! কি আর তোরে বলিব? ছি—ছি—এই নিষ্কলঙ্ক কুলে তুই কলঙ্ক দিবি? তোর লজ্জা কোথায় গেল? বসুদেব যাহার পিতা, রামনারায়ণ যাহার ভ্রাতা। ভদ্রা! আজ রামনারায়ণ যে—ত্রিলোকপূজ্য, তুই কি আজ ইঁহাদিগকে লজ্জা দিতে চাহিস্? আর কি কোন কুলে অনূঢ়া কন্যা নাই? পর পুরুষ দেখিয়া কে কবে তোর মত মোহিত হইয়াছে? পর পুরুষ দেখিয়া প্রাণ ধরিতে পারিস্ না? ছি ছি একি সরমের কথা। কন্যার স্বাধীনতা কি আছে? পিতা মাতা ভ্রাতা কেহ যদি দান না

করে, তবে কি স্ত্রী লোকের বিবাহ আছে? স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় কি বিবাহ করিতে পারে? যে আপন ইচ্ছায় বিবাহ করে, যাহাকে কেহ দান করে না, সে যে ভ্রষ্টা, সে যে কুলটা। ছি! ভদ্রা এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর্, ধৈর্য্য ধর্, একথা আর মুখে আনিস্ না, চল্ আমরা গৃহে যাই যেন একথা কেহ না শুনিতে পায়।

ভদ্রার চক্ষে জল, জলভরা চক্ষে মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় ভদ্রা সত্যভামার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। চির দিন ভদ্রা আদর পাইয়াছে, তিরস্কারের আজ এই প্রথম। ভদ্রা কি যেন বলিতে চায় বলিতে পারে না, শেষে অতি কষ্টে কথা ফুটিল; সত্যভামার নিষ্ঠুর বাক্যে নারীজন্মের উপর ধিক্কার আসিল।

সত্যভামা বহু বুঝাইলেন কিন্তু সব উপদেশ ভাসিয়া গেল। ভদ্রা বলিল—তুমি যাহা বলিতেছ সকলই সত্য—তোমার কথাই ঠিক। সখি! আমার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই।

সত্যভামার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইয়াছে, সত্যভামা বলিলেন ভদ্রা! তোর এই কাতরোক্তি আমি শুনিতে পারি না, তুমি শান্ত হও, আমি তোমার বিবাহ দিব; উত্তম বংশজাত, শৌর্য্যবীর্য্যযুক্ত, পরমপণ্ডিত, পরমসুন্দর পুরুষে তোমায় অর্পণ করিব, ইহা তোমার মনোনীত হইবেই!

ভদ্রা কিছুই বলে না—যখন কিছু বলিল তখন বলিল 'সখি! আমি এ প্রাণ ত্যাগ করিব। আমার জন্য আর একুলে কলঙ্ক দিব না, আমি ধনঞ্জয়কেই বরণ করিয়াছি। সখি! কি বলিব, তাঁহাকে না দেখিলে যেন আর ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারি না। যদি তুমি অদ্যই ইহার প্রতীকার না কর তবে নিশ্চয় আমার বধ তোমায় লাগিবে!'

সত্যভামা এখন নিজেই অস্থির হইয়াছেন,—বলিলেন ভদ্রা! অদ্য রজনীতেই আমি তোমায় ধনঞ্জয় হস্তে সমর্পণ করিব।

আশ্বাসে ভদ্রা সুস্থ হইল। সত্যভামা ভদ্রার গৃহ ত্যাগ করিলেন।

দশম অধ্যায়।

বিবাহের মন্ত্রণা।

ভদ্রাকে আশ্বস্ত করিয়া সত্যভামা ব্যস্ত সমস্তে ভদ্রার গৃহের বাহিরে আসিলেন। রাত্রি প্রহরাতীত, সত্যভামা অতি সন্তর্পণে পথে চলিতেছেন; কিছু দূরেই অর্জ্জুনের শয়নকক্ষ। সত্যভামা অতি ধীরে শয়নকক্ষের বহির্দ্বারে আসিয়াছেন। অর্জ্জুন একা, কৃষ্ণ নাই; সত্যভামা ফিরিলেন, সহসা কার্ণিসের নিম্নভাগ হইতে একটা পেচক শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল, আর দূরে কতকগুলি পক্ষী চিচিকুচি করিয়া উঠিল। সত্যভামা দ্রুতপদে নীচে আসিলেন, পক্ষী গুল একবার ক্ষণতরে শব্দ করিয়াই নীরব হইল। চারি দিক এখন নিস্তব্ধ। সত্যভামা আপন প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছেন, মনে হইল কে যেন পশ্চাতে; সত্যভামা দাঁড়াইলেন, একবার পশ্চাৎ ফিরিলেন; কে যেন তাঁহার অগ্রে আসিল; সত্যভামা দ্রুতপদ সঞ্চারে আপন শয়ন কক্ষের নিকটে আসিয়াছেন; আশ্চর্য্য সেই মূর্ত্তি অগ্রেই উপরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সত্যভামা সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন আর কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংবাদ কি ?"

সত্যভামার মনে হইল কৃষ্ণই সঙ্গে ছিলেন, এই মাত্র তিনি আসিয়াছেন; গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ভাবিলেন কৃষ্ণ যেন অনেকক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সত্যভামা বহুবার এরূপ দেখিয়াছেন, শতবার মনে মনে বলিয়াছেন এত ভাল বাসিতে আর কে জানে ?

আজ সত্যভামা নিতান্ত ব্যস্ত। মুখে কাতরতার চিহ্ন। সত্যভামার কথায় কথায় অভিমান। কৃষ্ণ সর্ব্বদা সত্যভামার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। সত্যভামার এভাব নূতন, কৃষ্ণ সমস্তই অনুমান করিয়াছেন, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন "সংবাদ কি?"

সত্যভামা। তোমার ভগিনী ভদ্রা প্রাণত্যাগ করিবে।

কৃষ্ণ। মহাদেবী যার জন্য ব্যাকুল সে কি প্রাণত্যাগ করিতে পারে?

সত্যভামা। অর্জ্জুনকে দেখিয়া পর্য্যন্ত ভদ্রা উন্মাদিনী। ভদ্রাকে আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি। ভদ্রা বালিকা, ভদ্রা কপটতা জানে না, লজ্জা কি ভাল করিয়া বোঝে না, যাহা হৃদয়ে আইসে, তাহাই বলিতে চায়, বলিতে বলিতে আবার চাপা দেয়, আবার না বলিয়াও থাকিতে পারে না। আমাকে বলে আমি অর্জ্জুনকে বরণ করিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না। আমি তিরস্কার করি, ভদ্রা কাঁদে, ভদ্রার চক্ষের জল দেখিলে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়। কখন বলে সখি! যাহাতে আমি নিরন্তর তাহাকে দেখিতে পাই, তুমি তাহাই করিয়া দাও, নতুবা "নারীবধ তোমার উপরে।" মহাশয়ের ভগিনীর সংবাদ দিলাম এক্ষণে যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করুন্।

কৃষ্ণ হাসিতেছেন। বলিলেন ভালই হইয়াছে, আমি অর্জ্জুনের অনুরাগ লক্ষ্য করিয়াছি। আর ভাবিতেছিলাম বহু দিনে অর্জ্জুন এখানে আসিয়াছে কি দিয়া সখাকে সন্তোষ করিব, ভালই হইল। অর্জ্জুনকে ভদ্রা দান করিব।

সত্যভামা মুখ কপাল ঈষৎ আকুঞ্চিত করিয়া মস্তক সঞ্চালিত করিয়া মনের ভাব জানাইলেন, শেষে বলিলেন—

আশ্বাস ত দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এ বিলম্বও সহ্য হইবে না।
আমি ভদ্রার ক্লেশ দেখিতে পারি না। ভদ্রা বড়ই সুকুমারী।
আমি বলিয়া আসিয়াছি, আজ রাত্রেই তোমায় অর্জ্জুনের হস্তে
সমর্পণ করিব। ইহা না হইলে ভদ্রা নিশ্চয়ই প্রাণ তাগ করিবে।

"ভদ্রা অপেক্ষা দূতীর জেদ বেশী দেখিতেছি" কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে আরও বলিলেন—"কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমার সাধ্য নয় তুমিই করিও, যাহাতে কোন বিপদ না হয়।"

"তোমার সাধ্য নাই, কিন্তু আমার সাধ্য আছে এই আমি চলিলাম।" সত্যভামা ভদ্রার উদ্দেশে চলিলেন। আজ্ঞা মিলিয়াছে, সত্যভামা সেই রাত্রেই ভদ্রার সঙ্গে অর্জ্জুনের শয়নকক্ষে গমন করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন—সত্যভামা—সুভদ্রা।

রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরে উপনীত হইতেছে। রাজবাটীর অন্তঃপুর নিস্তব্ধ। উপরে আকাশ বড় প্রশান্ত। ধীরে ধীরে আকাশ-পথে সপ্তর্ষিমণ্ডল চলিয়াছেন। ধীরে ধীরে দুই একটী দেবকন্যা যেন ছায়াপথে চলিতেছেন। আর নীচে সুভদ্রা-সঙ্গে সত্যভামা অর্জ্জুনের শয়নমন্দিরে গমন করিতেছেন।

ভদ্রাকে বাহিরে রাখিয়া সত্যভামা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কক্ষদ্বার রুদ্ধ। শ্রীমতী কনককপাটে জোরে আঘাত করিতে লাগিলেন, শেষে অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! বলিয়া ডাকিলেন স্ত্রীকণ্ঠস্বর শুনিয়া অর্জ্জুন বিস্মিত হইলেন। দ্বার মুক্ত না করিয়াই অর্জ্জুন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"দ্বার খোল কিছু গুপ্তকথা আছে আমি—সত্যভামা।"

অর্জ্জুন ব্যস্ত সমস্তে দ্বার উন্মোচন করিলেন—প্রণাম করিয়া বলিলেন, অর্দ্ধেক রজনী প্রায় অতীত হইয়াছে, এত রাত্রে আপনি কি জন্য? যদি প্রয়োজন ছিল কোন দূত পাঠাইলেই আমি আজ্ঞামাত্র যাইতাম। দূত না পাঠাইয়া আপনি আসিয়াছেন কেন?

সত্যভামা। তুমি অবশ্যই কিছু অনুমান করিয়াছ, এ কার্য্য দূত দিয়া হয় না, তাই আমি আপনি আসিয়াছি। আমার সঙ্গে আইস।

অর্জ্জুনের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সত্যভামা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অর্জ্জুন বিস্মিত। অর্জ্জুন অনিচ্ছাসত্ত্বেও

উঠিলেন। বাহিরেই এক খানা পর্য্যঙ্ক। গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তী আলোক এখানে পঁহুছিল না, অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া সত্যভামা বাহিরে আসিলেন। অর্জ্জুন অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে দেখিলেন বাহিরে পর্য্যঙ্কে অন্য একটী স্ত্রীলোক।

সত্যভামা ভদ্রার নিকটে উপবেশন করিলেন। ভদ্রা শয়ন করিয়াছিল। ধীরে ধীরে সত্যভামা ভদ্রার হস্ত আপন ক্রোড়দেশে স্থাপিত করিলেন। পরে অর্জ্জুনকে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছেন অনুমান সত্য। সহসা সত্যভামা বলিলেন—অর্জ্জুন! আমি তোমাকে এক কন্যা সম্প্রদান করিব।

অর্জ্জুন। এ কি ভদ্রা?

সত্যভামা। যদুকুলে ইহার জন্ম। রামনারায়ণ ইহার ভ্রাতা। এ কন্যা এত দিন অনূঢ়া ছিল, গান্ধর্ব্ব সম্প্রদান ক্ষত্রিয়ের বিধি, তুমি এ কন্যা গ্রহণ কর।

অর্জ্জুন। মহাদোষ! শ্রীকৃষ্ণ বলভদ্র যে কুলের অধিপতি, তাঁহাদের অসাক্ষাতে এ কার্য্য করিলে আমার নিন্দা হইবে। আমি তাঁহাদের সাক্ষাতে এ কন্যা গ্রহণ করিব।

সত্যভামা। আর আমি কি যদুকুলের কেহ নই?

অর্জ্জুন ফাঁফরে পড়িলেন, যাঁহার অভিমানের ভয়ে যদুপতি শঙ্কিত, অর্জ্জুন কি উত্তর দিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

সত্যভামা এবার অন্য কথা পাড়িলেন। অর্জ্জুন! তোমার বনচর্য্যার প্রকৃত কথা আমি জানি।

অর্জ্জুন। আপনার অজানা কি আছে, জগৎপতি যাঁহার পাত তিনি না জানেন কি?

সত্যভামা। গোধন চুরি সব মিথ্যা।

অর্জ্জুন। এ ক্লেশভোগ কি শুধু শুধু?

সত্যভামা। ক্লেশ? ক্লেশের আকার প্রকার কি তোমার কাছে আছে? সবই শুধু শুধু। কি জানি পাঞ্চালী কি গুণ জানে। না দেখিলে থাকিতেই পার না, একটীবার করিয়া দেখা চাই; দেখিতে গিয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস। ইহাও ভাল. কেন না তার জন্য ত বনবাস।

অর্জ্জুন। এ কথা আপনি ভিন্ন আর কে বলিবে?

সত্যভামা। কিন্তু এ চর্য্যার গুরু কে? ভণ্ডামী করিয়া ব্রহ্মচারী হইয়াছ। পুরুষ নারীর জন্য সর্ব্বত্র ব্যাকুল, কিন্তু তোমাতেই দেখি বিপরীত ভাব?

অর্জ্জুন। আর কোথাও দেখেন নাই?

সত্যভামা। তাই জিজ্ঞাসা করি গুরু কে?

অর্জ্জুন। আর কে? মহাদেবি! যদি সত্যই আমা কর্ত্তৃক চুরি হইয়া থাকে, এ কার্য্যের গুরু আপনার পতি শ্রীপতি। এ ত ছার কথা, যে কৃষ্ণ ভজন করে সে জগৎ ভুলাইতে পারে। মহাদেবি! আপনারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কিসে ভুলিয়াছেন? কৃষ্ণ কামুক হইলে কামিনী ভুলাইতে পারিতেন না। কৃষ্ণ কামদেবের পিতা; শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে সকল কামনা শান্ত হইয়া যায়। তাই বলি শুধু রমণী কেন—কি পুরুষ, কি নারী, আজ সকলেই মোহিত। আমি কৃষ্ণ ভজন করি, উপাস্যের গুণ তাঁহার ভক্তে যদি সঞ্চারিত হইয়া থাকে; ইহা কি ভক্তের দোষ? এ কি স্বাভাবিক নয়?

সত্যভামা। স্বাভাবিক সত্য। আর যেমন গুরু তেমনি শিষ্য। এখন কন্যা গ্রহণ কর, এ কার্য্যে শ্রীপতির অনু- মতি আছে।

সত্যভামা অর্জ্জুনের হস্ত ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমতীর বাম পার্শ্বে ভদ্রা দক্ষিণে অর্জ্জুন। শ্রীমতী আপন হস্তের উপরে অর্জ্জুনের দক্ষিণ হস্ত রাখিলেন; অর্জ্জুন সকলই বুঝিলেন, কোন বাধা দিলেন না। শ্রীমতী অর্জ্জুনের হস্তোপরি ভদ্রার হস্ত যোজনা করিলেন। ভদ্রা সর্ব্ব শরীরে এক আনন্দভরা তড়িৎপ্রবাহ অনুভব করিল। অর্জ্জুন ভদ্রাস্পর্শে কণ্টকিত হইলেন। শ্রীমতী বলিতে লাগিলেন আমার বড় আদরের ভদ্রাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম, দেখিও যেন অযত্ন হয় না।

অর্জ্জুন দেখিতেছেন ভদ্রাহস্তস্পর্শে আপন হস্তের কোন চলন নাই, তথাপি ভদ্রার হস্তের উপরিভাগে অঙ্গুলী মার্জ্জন করিয়া ভদ্রাকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন, শেষে প্রকাশ্যে বলিলেন "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য"।

সেই সময়ে দ্বারকায় মধ্যরাত্রজ্ঞাপক শঙ্খধ্বনি হইল। সম্মুখের মালতী বৃক্ষে একটা কোকিল ঘুম ঘোরে শব্দ করিয়া উঠিল, আর সেই প্রাঙ্গনস্থিত পুষ্পবৃক্ষ হইতে দুই একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প বায়ুভরে ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া সমীরণকে কাণে কাণে গন্ধ ছড়াইতে বলিয়া দিল। সম্প্রদান হইল গোপনে তথাপি রঙ্গময়ী প্রকৃতি রাণীর বাসর সজ্জা বাদ পড়িল না।

সত্যভামা ভদ্রাকে অর্জ্জুনের গৃহে রাখিয়া আপন মন্দিরে গমন করিতে চান, ভদ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল; তখন তিন জনে অর্জ্জুনের শয়নকক্ষে আসিলেন। দীপালোকে অর্জ্জুন ভদ্রার দিকে চাহিলেন। ভদ্রা লজ্জায় আত্মশরীরে যেন বিলীন হইতেছিল।

সত্যভামা ভদ্রার কাণে কাণে কি বলিলেন। ভদ্রা ইচ্ছা অনিচ্ছায় অর্জ্জুনের শয়নকক্ষে উপবেশন করিল। সত্যভামা

যাইবার কালে বলিয়া গেলেন—আমার কার্য্য অনেক, আমি অনতিবিলম্বে একজন দাসী পাঠাইব; তাহাকে তুমি বিশ্বাস করিতে পার, ভদ্রা-সম্প্রদান গোপন রাখিও। সত্যভামা কক্ষ ত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন ও ভদ্রা রহিলেন।

আমরা রামায়ণে দেখিয়াছি লক্ষ্মণ জিতেন্দ্রিয়। বনবাস-কালেও জনকনন্দিনীর মুখের পানে কখনও তাকান নাই, অথচ প্রত্যহ প্রহরী স্বরূপে কুটিরদ্বারে অনন্তনাগ সহস্রফণা বিস্তার করিয়া যেমন ক্ষিরোদশায়ী লক্ষ্মীনারায়ণকে বেড়িয়া থাকে, লক্ষ্মণ সেইরূপ থাকিতেন। কোন নিশাচর বা কোন বন্য পশু পাছে সীতারামের কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে, লক্ষ্মণ সেই জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন—সীতার চরণেই লক্ষ্য ছিল, কখন মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

যখন রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া যায়—যখন রাম সীতা-শোকে পম্পাতীরে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করেন তখন দশাননরথারূঢ়া সীতার বিক্ষিপ্তালঙ্কার রামের দর্শনপথে পতিত হয়, কিন্তু চক্ষু হইতে বিন্দুর পর বিন্দুধারা এরূপভাবে বিগলিত হইতেছিল যে রাম অলঙ্কারগুলি ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। অলঙ্কার লক্ষ্মণের হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ দেখি এ কি সীতার অলঙ্কার?

লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন 'প্রভো! আমি মা জানকীর চরণ ভিন্ন অন্য অঙ্গ কখন লক্ষ্য করি নাই।

নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কঙ্কণে
নূপুরে চাভি জানামি নিত্যং পদাভিবন্দনাৎ॥

এ ত নূপুর নয়—আমি মার চরণ-নূপুর ভিন্ন অন্য অলঙ্কার চিনি না। সংযমী জানেন কি তাঁহার প্রয়োজন, যাহাতে কোন

আবশ্যক নাই, তাহা লক্ষ্য করাও অনাবশ্যক। লক্ষ্য করা ব্যভিচার। সর্ব্ব ব্যভিচার ত্যাগ না হইলে রাম মিলে না, তাই ভক্ত আপন লক্ষ্যে এত তন্ময়। ভিতরে পশ্চাতে আপন ধ্যানে এত নিমগ্ন যে সম্মুখে প্রকৃতির হাবভাব তাঁহার চক্ষে পড়িলেও মন ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময় বলিয়া ইহা রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী হইতে পায় না। লক্ষ্মণের মত এই অর্জ্জুনও সংযমী। ভবিষ্যতে এই অর্জ্জুন যখন ইন্দ্র সভায় গমন করেন, অপ্সরাদিগের নৃত্যকালে যখন উর্ব্বশীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন. ইন্দ্র নিশীথে অর্জ্জুনশয়ন-কক্ষে যখন উর্ব্বশীকে প্রেরণ করেন; যখন উর্ব্বশী অর্জ্জুনকে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তখন জিতেন্দ্রিয় এই মহাপুরুষ নির্জ্জন শয়নমন্দিরে দেবতা-মনোহারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এই দেব-কন্যাকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন; উর্ব্বশীর হাবভাবে মোহিত না হইয়া ঐ নিভৃতকক্ষে, রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে উপযাচিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"কুন্তী ও মাদ্রীর মত তুমিও গরিষ্ঠা। তুমি শুধু আমার জননী নও, আমার কুলের জননী।"

উপস্থিত ক্ষেত্রেও অর্জ্জুন জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দেখাইলেন। ভদ্রা একাকিনী অর্জ্জুনের শয়নকক্ষে। অর্জ্জুন ভদ্রাকে স্পর্শ করিলেন না। আর ভদ্রা? ভদ্রা ভাল করিয়া অর্জ্জুনের দিকে চাহিতে পারে না। যদিও ক্ষত্রিয়াণী, তথাপি নবানু-রাগের কাছে অন্য তেজ পরাস্ত। ভদ্রার গৌরবর্ণ মুখকান্তি পুনঃ পুনঃ কুঙ্কুমবর্ণ ধারণ করিতেছে; অর্জ্জুন ইহা লক্ষ্য করিলেন। অর্জ্জুন ভদ্রার নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন, ভদ্রার সঙ্কোচ-ভাব দূর করিবার জন্য ডাকিলেন "ভদ্রা"! ভদ্রা উত্তর দিতে পারে না। অর্জ্জুন ভদ্রাকে আবার আদর করিলেন—বলিলেন

"আমার ভদ্রা"। ভদ্রার মর্ম্মে মর্ম্মে 'আমার ভদ্রা' লাগিয়া রহিল। ভদ্রা গোপনে "আমার ভদ্রা" বলিয়া বিভোর হইত। আপনার নাম কি আপনার নিকট বড় মিষ্ট লাগে, প্রিয়জনের মুখ হইতে আসিয়াছে বলিয়া?

তখনও সুভদ্রা অর্জ্জুনের নিকটে বসিয়া। এই সময়ে দূতি আসিল। ভদ্রা উঠিল। বহুকষ্টে দূতি সঙ্গে ভদ্রা আপন মন্দিরে গমন করিল।

সেই রজনীতেই সত্যভামা গোবিন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। সত্যভামা অর্জ্জুনের বহু প্রশংসা করিলেন, শেষে বলিলেন—আমি তোমার আজ্ঞামত ভদ্রাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে সম্প্রদান করিয়াছি, এখন রজনী প্রভাতে তুমি বিবাহের আয়োজন কর। চতুর্দ্দিকে দূত পাঠাইয়া কুটুম্বাদি আনয়ন করা হউক—এ কার্য্যে কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে।

গোবিন্দ বলিলেন "এই কথাই ঠিক"। সত্যভামার সব তাড়াতাড়ি। যাহা মনে হইয়াছে সেই দণ্ডে তাহা করা চাই। "হামার বচনে করবি জলপান" ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক ভক্তের জন্য ক্রীড়ার পুতুল সাজেন। কৃষ্ণ জানেন এ কার্য্যে কিছু গোলযোগ ঘটিবে; বলিলেন—

'প্রাতঃকালেই ত বিবাহের উদ্যোগ করিব, কিন্তু বলদেব অর্জ্জুনকে দেখিতে পারেন না, অর্জ্জুনকে সুভদ্রা দান করা বলদেবের অভিপ্রেত নহে।'

সত্যভামার তাতে কি? সত্যভামা রহস্য করিলেন—বলিলেন 'তবে উপায় কি?' যেন কতই চিন্তা। সমস্তই যাঁর শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ, তাঁর সর্ব্ব চিন্তাও ত শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত। তবে যে এত ব্যস্ত সমস্ত? এ বুঝি লৌকিক ব্যবহার। সত্যভামা আবার বলিলেন "উপায় কি?"

শ্রীকৃষ্ণ। "উপায় করিব।"

দ্বাদশ অধ্যায়।

বলভদ্র।

সম্প্রদানের রাত্রি শেষ হইল। প্রভাত কাল বড় সুন্দর হইয়া আকাশে উঠিতেছিল, উঠিতে উঠিতে আর উঠিল না। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া সুখের প্রভাতের দিকে ক্রোধ দৃষ্টি করিলেন—আর সুখের দৃশ্য রহিল না। কাল কাল মেঘ আসিয়া প্রভাতকালকে ঈষৎ তমসাচ্ছন্ন করিল। যাদবেরা প্রাতঃকালে স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব রাত্রির অঙ্গীকারমত নারায়ণ সভাস্থলে সুভদ্রার বিবাহকথা উত্থাপন করিলেন।

বড়ই গম্ভীর ভাবে কথাটা পাড়িলেন। ভদ্রাকে দেখিয়া তাঁহার মনস্থির হইতেছে না, ভদ্রা বিবাহের যোগ্যা তথাপি অবিবাহিতা। অনূঢ়া কন্যা ঋতুবতী হইলে কন্যার পিতৃমাতৃকুল সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত অধোগামী হয়। ঐ কন্যার অন্নজল অস্পৃশ্য, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা। মনুষ্যের মন পুষ্পের মত। প্রথম পুষ্পোদ্গমে বৃক্ষ বীজধারণের উপযোগী হয়। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে প্রজাপতি ভ্রমরাদি আকৃষ্ট হইয়া আইসে। নারীর এই অবস্থায় বিশেষ সতর্ক না হইলে হৃদয় কলুষিত হয়, তখন প্রকৃত সতীত্ব নষ্ট হইয়া যায়। অবিবাহিতা কন্যার মনে প্রথম পুষ্পোদ্গমে যে সংস্কার পড়ে সে সংস্কার বড়ই প্রবল। এই জন্যই পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বেই বিবাহকাল। ইহাই আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এইরূপ কন্যার যদি বিবাহ না দেওয়া যায় তবে ঋষি-বাক্যের অমর্য্যাদা জন্য কুলে কলঙ্ক হয়, এবং কুল কলঙ্কিত হয়।

সপ্তম বৎসরের কন্যা দান করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। অষ্টম, নবম, দশম বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহকাল। ভদ্রার বিবাহকাল বহু-দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতঃপর আর বিলম্ব করা উচিত নহে। আমি ভদ্রার জন্য এক পাত্র মনোনীত করিয়াছি। কি রূপ, কি গুণ, কি কুল, কি শীল, কি বল সকল বিষয়েই পার্থ বিবাহের যোগ্য পাত্র।

কথার পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ হইয়াছে। ভগবান নিজেই সমস্ত করেন, লোক নিমিত্তভাগী মাত্র। সেইটুকুই মানুষের কর্ম্মভোগ।

যাহা হউক কৃষ্ণের কথায় বসুদেব অমত করিলেন না। অন্যান্য সকলেই বড় সন্তুষ্ট হইলেন। সাত্যকি বলিলেন 'যদি যদুকুলের ভাগ্য থাকে তবেই ভদ্রা অর্জ্জুনের গলে মাল্য প্রদান করিবে। অর্জ্জুনসমান এ পৃথিবীতে আর কে আছে?'

সকলের মত হইল, এক মত হইল না বলভদ্রের। কৃষ্ণ পূর্ব্বেই ইহা জানিতেন। বলদেব সকলের মত শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন, ভ্রূকুটি করিয়া উত্তর করিলেন—সুভদ্রার জন্য আপনাদের চিন্তা করা বৃথা। আমি তাহার বিবাহ নিশ্চয় করিয়াছি। রাজা দুর্য্যোধন কৌরব বংশের চূড়ামণি। কৌরব বংশের কোন নিন্দা নাই। দুর্য্যোধন বলে বলীয়ান, রূপে কন্দর্পের তুল্য। অর্জ্জুন কোন অংশে তাহার শতাংশের একাংশও নহে। আমি দুর্য্যোধনকে সুভদ্রা সম্প্রদান করিব।

হলধর তখন দুর্য্যোধনকে আনয়নজন্য লোক প্রেরণ করিবার কথা উত্থাপন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল। বলভদ্র কাহারও মত গ্রহণ না করিয়া স্বহস্তে দুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। পত্রের সারধর্ম্ম এই—"দুর্য্যোধন!

তোমায় আমি আমার ভগ্নী সুভদ্রাকে দান করিব, তুমি সুসজ্জ হইয়া দ্বারকায় আসিবে"।

দূত পত্র লইয়া হস্তিনামুখে ছুটিল। অতি সত্বর এই কর্ম্ম সমাধা হইল, কেহ কিছু বলিবার অবসর পাইলেন না। প্রতিবাদ করিতে কাহারও সাহস হইল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিবাহে বিভ্রাট।

"দুর্য্যোধনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হইবে" এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দ্বারকাবাসী সকলেই ইহা শুনিল। সত্যভামা অন্যের মুখে এ সংবাদ শ্রবণে বড়ই ভীতা হইলেন। অর্জ্জুনও ভদ্রাকে সাবধান করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সত্যভামা বড় দ্রুতপদে ভদ্রার নিকটে যাইতেছেন।

আর ভদ্রা? পূর্ব্বরাত্রে দাসী ভদ্রাকে তাহার প্রাসাদে দিয়া গেল, ভদ্রা দ্বার রুদ্ধ করিলেন কিন্তু নিদ্রা কোথায়? ভদ্রা কতক্ষণ আপন শয্যায় উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃতি ঘটিতেছে। ভদ্রা দেখিতেছেন—অর্জ্জুন সম্মুখে বসিয়া আদর করিয়া বলিতেছেন "আমার ভদ্রা", ভদ্রা অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিয়াছে "তোমারই", হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। ভদ্রা দেখিতেছে সে আপন গৃহে বসিয়া আছে। ভদ্রার শূন্য গৃহ ভাল লাগিল না, দ্বারমুক্ত করিয়া বারাণ্ডায় আসিল। একবার বাহিরের বায়ু শরীর স্পর্শ করিল। ভদ্রা শুনিল "আমার ভদ্রা", বাক্য যেন বায়ুর উপরে চড়িয়া দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ভদ্রা ছাদে আসিল। মুক্তকুন্তলা ভদ্রা যেখান হইতে অর্জ্জুনের শয়নকক্ষ দেখা যায়, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। অর্জ্জুনের প্রাসাদের উপরিস্থিত আকাশ ভদ্রার প্রিয়। ঐ দিকের বায়ু ভদ্রার প্রিয়, ঐ দিকের নক্ষত্র বড় মনোহর। শরৎকাল, শিশিরে ভদ্রার রুক্ষ কেশপাশ পরিসিক্ত, ভদ্রার তাহাতে দৃষ্টি নাই। ভদ্রা অর্জ্জুনের সুন্দর প্রাসাদের দিকে চাহিয়া আছে।

পূর্ব্বদিক অরুণরাগে রঞ্জিত হইল, স্তুতিপাঠকেরা স্তব আরম্ভ করিল, চারিদিকের আনন্দধ্বনিতে ভদ্রা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, শশব্যস্তে নীচে নামিল, কখন রাত্রি অতিবাহিত হইল ভদ্রার মনে নাই। ভদ্রা আপন কক্ষে আসিয়াছে, সম্মুখেই একখানা ময়ূরাকৃতি সিংহাসন। ভদ্রা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় করতলে মস্তক রাখিয়া সিংহাসনে দেহ স্থাপন করিয়াছে। চক্ষু নিমীলিত, এ অবস্থাকে জাগ্রতও বলা যায় না স্বপ্নও বলা যায় না। ভদ্রা এক জাড্যবর্জ্জিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিতেছে, যেন সেই রৈবতক পর্ব্বতের আলোকমালা, আর সেই আলোকরাশি ঘেরা সুন্দর শ্যামমূর্ত্তি। অর্জ্জুনকে দেখিয়া ভদ্রা যেন লজ্জিত হইয়াছে, আর অর্জ্জুন ভদ্রার হস্ত ধরিয়া আদর করিতেছেন, বলিতেছেন "আমার ভদ্রা"। অর্জ্জুন সম্মুখে কতকগুলি শুভ্র সুগন্ধ পুষ্প সজ্জীকৃত রহিয়াছে দেখিলেন। একটি একটি করিয়া, ভদ্রার রুক্ষ কেশপাশে শুভ্র পুষ্পগুলি সাজাইয়া দিতেছেন। নীল আকাশে নক্ষত্ররাজির মত সুনীল কেশপাশে পুষ্পগুলি বড়ই সাজিল। অর্জ্জুন দুই একটী পুষ্পকে স্থানচ্যুত দেখিয়া ভাল করিয়া সাজাইতেছেন। ভদ্রার মনে হইল তাহার মস্তকের একগাছি কেশ উৎপাটিত হইয়াছে, ভদ্রা হস্তবিস্তার করিয়া যেমন অর্জ্জুনের হস্ত ধরিতে যাইবেন, অমনি বিস্মিত হইয়া চক্ষু মেলিলেন, দেখিলেন সত্যভামা ভদ্রাকে চেতন করিবার জন্য ভদ্রার এক গাছি কেশ ধরিয়াছিলেন। ভদ্রা জাগিল। সত্যভামা ব্যস্ত হইয়া ভদ্রাকে বিবাহ বিভ্রাটের কথা বলিয়া সতর্ক করিলেন। ভদ্রা ভাল করিয়া বুঝিতে না বুঝিতে সত্যভামা উঠিলেন। ভদ্রা সত্যভামার হাত ধরিল, বলিল—কোথায় যাইবে?

সত্যভামা। অর্জ্জুনের নিকটে।

ভদ্রা। আমাকেও লইয়া চল।

সত্যভামার অন্য কোন কথা ভদ্রার মনে নাই। সত্যভামা ভদ্রাকে নিরস্ত করিলেন, বলিলেন 'ভদ্রা ধৈর্য্য ধর। এ কথা রাষ্ট্র হইলে বড় কলঙ্ক। দুর্য্যোধনের সহিত বিবাহ হইলে কি তোর ভাল হইবে?' ভদ্রা নিরস্ত হইল। সত্যভামা অর্জ্জুনের নিকট সকল কথা বলিলেন। অর্জ্জুন হাসিলেন, বলিলেন 'শ্রীপতির আজ্ঞা রহিত করে এমন কেহ দ্বারকায় নাই।' সত্যভামা কিন্তু ইহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

সেই দিনই দূত নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া হস্তিনাপুরে গিয়াছে। দিন শেষ হইল। সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুরে গিয়াছেন, সত্যভামা ছুটিয়া আসিলেন, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'বিবাহে বিলম্ব কেন?' সত্যভামা এখন পর্য্যন্ত কৃষ্ণের মুখে কিছুই শুনেন নাই। গোবিন্দ বলিলেন, মহাদেবি! কিসের বিবাহ? অর্জ্জুনের নামে বলভদ্র অগ্নিতুল্য হইয়াছেন। কিছুতেই অর্জ্জুনকে কন্যা সম্প্রদান করা হইবে না। দুর্য্যোধন সুভদ্রার উপযুক্ত পাত্র। দূত অদ্য নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া হস্তিনাপুরে গিয়াছে, শীঘ্রই দুর্য্যোধন বর সজ্জায় সাজিয়া আসিবে। অন্যান্য বহু নরপতিকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া সত্যভামা চমকিত হইলেন। অধোমুখ করিয়া ভূমিতে বসিলেন। কৃষ্ণ যাঁর স্বামী, তিনিও ভুলিয়া যান—যোগমায়া এমনই বস্তু। ভুলানই কৃষ্ণের লীলা।

কতক্ষণ পরে সত্যভামা বলিতেছেন—বল এখন কি উপায় হইবে? ভদ্রার জন্য যে বড় অনর্থ হইল। একথা শুনিলে অর্জ্জুন কি মনে করিবে? আমি যে সম্প্রদান করিয়াছি। তুমি কি অন্য বরে ভগিনীকে দিতে চাও? বল মৌন রহিলে কেন? যদুকুলে কি আমার কলঙ্ক রটাইতে চাও?

কিছু নাই শুধু শুধু যাঁর অভিমান সেই অভিমানিনীর মান ভরা মুখে একটা বিষাদের কাল ছায়া পড়িয়াছে। বৃষ্টির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কাল মেঘ দেখিয়া লোকে যাহা বুঝে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ একটা কিছু বুঝিয়াছেন। কতকক্ষণ পরে বলিলেন 'শুন সত্যভামা অধৈর্য্য হইও না, আমি ইহার উপায় করিব।' সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণবাক্যে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ উপায়টা একেবারে খুলিয়া বলিলে বুঝি ভাল হইত।

শ্রীমতীর মানভঙ্গের পর শ্রীকৃষ্ণ বংশী স্পর্শ করিয়া শত শত শপথ করিতেন। শ্রীমতী বিশ্বাস করিতেন না, বলিতেন—

"বংশী পরশি শপথি শত শত তবহি প্রতীত নাহি বোলে" বলিতেন—

যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতব বাদম্।
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্॥

দ্বারকাতেও তাহাই হইত। সকলে বলিত—"বাহিরটি যেমন কাল ভিতরটীও সেইরূপ"।

সেদিন সত্যভামা পরীক্ষা করিতে গিয়া কাঁদিয়াছিলেন। তথাপি ভ্রম গেল না। আহারান্তে সত্যভামা কৃষ্ণের নিকটে বসিয়া বীজন করিতেছেন, ঠাকুর কিন্তু বড়ই চঞ্চল। ইহা সত্যভামা সহিতে পারেন না। বলিতেছেন, ঠাকুর! আমি যদি তোমার বিরক্তির কারণ হই, তবে খাতিরে আমার কাছে থাকা কেন? ব্যথা বুকে দেখা দেওয়াই বা কেন? যার জন্ম চঞ্চল তার নিকটে যাও, আমি চিরদুঃখিনী, চিরদুঃখিনীই থাকিব। রুক্মিণীর কাছে গেলে আমি সন্তুষ্ট হইব।

বিপত্তি বুঝিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন, না সত্যভামা আমি রুক্মিণীর জন্ম অস্থির হই নাই।

সত্যভামা। তবে রাধার জন্য ?

কৃষ্ণ। না সত্যভামা তাও নয়।

গোপিণীদিগের "তবহি প্রতীত নাহি বোলে" একথাও ত মিথ্যা নয়। আচ্ছা বলত এত চঞ্চল কেন ?

কৃষ্ণ সত্যকথাই বলিলেন। বলিলেন আমি আহার করিয়াছি আর দেখিতেছি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে সকলেই আহার পাইয়াছে। সকলেই তৃপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের তৃপ্তি আমার এই ক্ষুদ্র মায়িক দেহটুকুতে ধরিতেছে না, এই দেহকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সত্যভামা প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না মনে মনে করিলেন, রো'সো ঠাকুর! কাল তোমায় পরীক্ষা করিব।

পরদিন প্রভাতে—সত্যভামা কৃষ্ণ পূজার জন্য ফুল তুলিতে গিয়াছেন, পুষ্পমধ্য হইতে একটী অতিক্ষুদ্র কীট তুলিয়া একটী সোণার কৌটায় আবদ্ধ করিলেন, এবং সেই কৌটাটী মাথার খোঁপায় গুঁজিয়া রাখিলেন; দেখিবেন আজ সে জীব আহার পায় কিরূপে ?

হায়! যাঁহার হস্তে অনন্তকোটী জীব বিমোহিত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নাচিতেছে, ভক্ত তাঁহাকেও পরীক্ষা করিবে; তাঁহাকেও নাচাইবে—তাঁহাকেও ভর্ৎসনা করিবে। ভক্তের এই পরীক্ষাতে ভগবান বড়ই প্রীত হয়েন। ভগবান বলেন—

প্রিয়া যদি মান ক'রে করয়ে ভর্ৎসন।
বেদ স্তুতি হৈতে তায় হরে মোর মন॥

মাধুর্য্য লীলার কাছে ঐশ্বর্য্যের লীলা ছার।

আহারের সময় হইল। কৃষ্ণ আহার করিলেন, আহারান্তে

শ্রীভগবান সেইরূপ চঞ্চল। সত্যভামা টিপি টিপি হাসিতেছেন, আর বলিতেছেন—ঠাকুর! তোমার কথা কি সত্য?

কৃষ্ণ। কি কথা সত্য সত্যভামা?

সত্যভামা। তুমি কাল বলিয়াছ "আমি আহার করিয়াছি আর দেখিতেছি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে সকলেই আহার পাইয়াছে।"

কৃষ্ণ। হাঁ সত্যভামা সকল জীবই আহার পাইয়াছে।

সত্যভামা হাসিতেছেন মনে মনে আবার ভাবিতেছেন—"রও ঠাকুর! এখনই তোমার সত্যকথা বাহির করিব"। তখন সত্যভামা ধীরে ধীরে আপন বদ্ধকেশপাশ হইতে কৌটা বাহির করিলেন, ধীরে ধীরে কৌটা হাতে লইলেন, বলিলেন "দেখ ইহাতেই তুমি কতদূর সত্যকথা বলিতেছ প্রমাণ হইবে, হাতে নাতে ধরা পড়িবে"।

অন্তর্যামী ভগবান হাসিতেছেন, আর বলিতেছেন—"কি সত্যভামা দেখাও দেখি তোমার লুক্কায়িত জীব কিরূপ অনাহারে আছে?"

ধীরে ধীরে সত্যভামা কৌটা খুলিল কিন্তু একি? সত্যভামার চক্ষু জলপূরিত হইতেছে, সত্যভামা কাঁদিতেছেন এবং বলিতেছেন প্রভো! আমি বুদ্ধিহীনা অবলামাত্র। আমি দাসী তুমি আমার অপরাধ লইওনা।

কৃষ্ণ। দেখি দেখি সত্যভামা তুমি কি দেখিয়া এরূপ হইলে?

তখন সত্যভামা দেখিতেছেন যেমন ক্ষুদ্র কীট তেমনি এক-গাছি ক্ষুদ্র তৃণ কে তাহাকে যোগাইয়াছে, কীট বড় আনন্দে যেন তাহা আহার করিতেছে, এখনও সত্যভামার চক্ষে জল। শ্রীকৃষ্ণ

পর্য্যঙ্কে বসিয়াছিলেন, চরণকমল দুটী নীচে প্রসারিত। সত্যভামা কৃষ্ণের চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বলিতেছেন—

প্রভো! আমি অল্পমতি, আমি তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া তোমার আদরে আত্মহারা হইয়া যাই, আমার মনে থাকে না যে তুমি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক। তুমি ভুলাইয়া দাও, আমি তোমায় পরীক্ষা করিতে যাই। তুমি জগন্নাথ, তোমার গতি দুর্ল্লক্ষ্য। আমি কি বুঝিব প্রভো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ তোমার মহিমা জানেন না।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি, পুনঃ তোঁহে সমাওত, সাগরলহরী সমানা॥

প্রভো! আমায় চরণে ঠেলিও না আমি তোমার দাসী।

কৃষ্ণের মায়ায় আজ আবার ভুল হইয়া গেল,—সত্যভামা বড়ই উতলা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন উতলা হইও না, উপায় করিব।

সত্যভামা কৃষ্ণের আশ্বাসে শান্ত হইতে পারিলেন না। বলিতে লাগিলেন, প্রাণেশ্বর! আমার বিপদ তুমি বুঝিতেছ না, যদি কেহ বলদেবকে সংবাদ দেয় তবে আর আমি মুখ দেখাইতে পারিব না। আমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। আমি শাশুড়ীর কাছে যাই; স্ত্রীলোকই স্ত্রীলোকের বেদনা বুঝিতে পারে।

সত্যভামা উঠিলেন। দৈবকীর নিকটে গিয়া ভদ্রার বৃত্তান্ত জানাইলেন। বড় কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন "মা, বড় লজ্জার কথা, আমি কি করিব বলুন। ভদ্রা ধনঞ্জয়কে দেখিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছে। আমার কাছে বলে "অর্জ্জুন নহিলে আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব"। আমি মা গোপনে ভদ্রাকে

ধনঞ্জয় হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, এখন শুনি ভদ্রার অন্য বিবাহ হইবে। ঠাকুরাণি! কি উপায় হইবে? কি করিব উপায় করুণ। যাহাতে কুলরক্ষা হয় তাহাই আপনাকে করিতে হইবে।

সত্যভামা সকলেরই আদরের বস্তু। দৈবকী এত আদর কাহাকেও করিতেন না। সত্যভামার কথা শুনিয়া রোহিণী সঙ্গে দৈবকী বলভদ্রের নিকটে গমন করিলেন।

দৈবকী বলিতে আরম্ভ করিলেন "বৎস; সকলেই অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতেছে। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে ফাল্গুনি সুভদ্রার যোগ্য পাত্র, বিশেষ পাণ্ডবেরা কুটুম্ব। তুমি এ বিবাহে অমত কর কেন?

রাম বিরক্ত হইয়া বলিলেন—মা! তুমি বুঝিয়া কথা কহিতেছ না? ধনঞ্জয় কি আমাদের কুটুম্বের যোগ্য? আমি দুর্য্যোধনকে ভদ্রা দান করিব, দূত পাঠাইয়াছি। পাণ্ডবের জন্ম বৃত্তান্ত কে না জানে? বুঝিতে পারি না কিহেতু পাণ্ডবের হস্তে তোমরা ভদ্রাকে দিতে চাও।

দৈবকী নিস্তব্ধ হইয়াছেন। এখন রোহিণীর পালা। রোহিণী আরও একটু জোরে বলিলেন—বাছা! সকলের বিচার লঙ্ঘন করা কি উচিত? তোমার পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেরই মত ধনঞ্জয়কে কন্যা দান করা। সকলের বাক্য অবহেলা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে, বিশেষ অর্জ্জুন ধার্ম্মিক ও গুণবান্। ইহাকে কন্যা সম্প্রদান না করিয়া কাহাকে সম্প্রদান করিবে? তুমি ক্রোধ কর আর যাই কর আমি কল্য প্রাতে সুভদ্রাকে পার্থে সম্প্রদান করিব।

বলভদ্র রুষ্ট হইয়াছেন। এদিকে জননী, কিছু বলিতে ও পারেন না। প্রথমে বিরক্ত হইলেন, দুই এক কথা বলিতে

বলিতে ক্রোধ বৃদ্ধি হইল, তখন বলদেব বলিতে লাগিলেন— নিতান্ত বাতুলের মত কথা কহিতেছ, মা বলিয়াই রক্ষা, অন্যে একথা বলিলে কি রক্ষা থাকিত? যাও এরূপ কথা আর মুখে আনিও না।

হলধর সকলকে নিরস্ত করিলেন সত্য, কিন্তু মনে মনে জানিতেছেন যে এ কার্য্যের মূলে গোবিন্দ। বলরাম কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু গোবিন্দের কাছে তিনি খেলার পুতুল। তিনি গোবিন্দকে ভয় করিতেন, গোবিন্দের সহিত বিরোধে তাঁর সামর্থ্য নাই। বুঝিতেছেন গোবিন্দের ইচ্ছা কি তথাপি নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, ভাবিতেছেন দিন থাকিতে একটা করিয়া বসিলে গোবিন্দ অন্য কিছু করিতে সাহস করিবে না।

বলরাম আবার বলিতে লাগিলেন—বলিতেছ গোবিন্দের এই বিবাহে মত আছে, কিন্তু গোবিন্দের জাতিবিচার নাই। দুটো ভক্তির কথা বলিলেই লোকে গোবিন্দের বন্ধু হয়।

বলরাম ঠিক বলিয়াছেন—গোবিন্দের জাতি কুল বিচার নাই। "ভক্তিতে ডাকিলে যাই চণ্ডালের বাড়ী।" গোবিন্দ ভক্তাধীন, "ভক্তিপ্রিয় মাধব" সকলেই এই কথা কহে। কৃষ্ণভক্ত বলেন,

"গোবিন্দ বিথার জলে এ তনু যে ভাসায়েছে
কি করিবে কুলের কুকুরে।"

বলদেব নিন্দাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিই করিলেন। যে দুটো ভক্তির কথা কয় গোবিন্দ তাহারই বশ।

হলধরের নিকট জননীগণ কথা কহিতে পারিতেছেন না। বলরাম আবার বলিতেছেন—মা গোবিন্দের কথা যে বলিতেছ, গোবিন্দের অবিচার দেখ, কাল দুর্য্যোধন কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে আপন

কন্যা লক্ষণা দান করিল; নূতন কুটুম্ব, গোবিন্দের তাহাতেও বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই। আমি গোবিন্দের ব্যবহারে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। দেখ দুর্য্যোধন আমার প্রিয় শিষ্য; আমি শিষ্য বলিয়া তাহাকে স্নেহ করি, তাই সকলে তাহার উপর ক্রুদ্ধ। কিন্তু আমি দুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রন করিয়াছি এখন আর কিছু বলা বৃথা। আমি থাকিতে কার সাধ্য অর্জ্জুনকে ভদ্রা সমর্পণ করে? যাও মা আর কিছু আমাকে বলিও না।

রোহিণী দেবকী বড় বিপন্ন হইয়া উঠিয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাতে হস্তিনাপুর হইতে দূত ফিরিয়া আসিল। দুর্য্যোধন সংবাদ দিলেন "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, শুভদিন দেখিয়া আমরা দ্বারকায় যাত্রা করিব।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

স্থির যুক্তি।

দেবকীও রোহিণী কিছুই করিতে পারিলেন' না, সত্যভামা ফাঁপরে পড়িলেন। এদিকে হস্তিনাপুর হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়াছে। সত্যভামা কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না; কত কি ভাবিতেছেন—ভদ্রার জন্য বড় বিপদ বুঝি উপস্থিত হয়। অর্জ্জুন বীর পুরুষ, হয়ত যুদ্ধ ঘটিবে কত লোক মরিবে।

সত্যভামা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। বড় দুঃখে বলিতে-ছেন 'ভদ্রা মরুক, না হয় জলে ডুবুক কিম্বা বিষ ভক্ষণ করুক'। ভদ্রা মরিলেই আপদ যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও মরি। লোক লজ্জা হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।

সত্যভামার পরামর্শে ভদ্রা রাজী কি না আমরা তাহার সংবাদ পাই নাই। আমাদের মনে হয় ভদ্রা কেন মরিবে? ভদ্রার ত কোন দুঃখ নাই। কষ্ট দূতীর বটে, দূতীকে সকল দিক রক্ষা করিতে হইবে।

বড় শীঘ্র শীঘ্র দিন কাটিতে লাগিল। সত্যভামার ইচ্ছায় এবং কৃষ্ণের অনুমোদনে অর্জ্জুনকে প্রতিদিন ভদ্রার সহিত দেখা করিতে হইত। এ দেখা গোপনে। বিবাহ বিভ্রাট ভদ্রা শুনিয়াছিল কিন্তু সত্যভামার নিষেধে ভদ্রা অর্জ্জুনকে কিছুই বলে নাই। ঐ সংবাদে ভদ্রা কিছুই বিচলিত হয় নাই। না হইবারই কথা। যাহার সহায় কৃষ্ণ ও সত্যভামা তাহার ভাবনা হইবে কেন? বিশেষ ভদ্রা অন্য রাজ্যে। কিরূপে ভদ্রার দিন

রাত্রি কাটিত ভদ্রা তাহার কিছুই যেন জানিতে পারিত না। অর্জ্জুন ভদ্রার ভাব দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত।

আজ ভদ্রা অর্জ্জুনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সন্ধ্যার সময় অর্জ্জুন ভদ্রার গৃহে আসিবেন। ভদ্রার দিন আর শেষ হয় না। দণ্ডে শত বার ভদ্রা ঘর বাহির করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্তাচলে উঠিলেন। অন্ধকারের ছায়া পড়িল, উপরে দুই একটী নক্ষত্র দেখা দিল। ভদ্রার "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।" এইত সন্ধ্যা হইল, কৈ সে ত আসিল না। যদি না আসিবে তবে বলা কেন? যদি বলিল তবে এলনা কেন? কোন কি বিপদ হইল? গোপনীয় কথা কি প্রকাশ হইল? সে কি এ দেশ ত্যাগ করিল? ভদ্রা এ বেগ রোধ করিতে পারিল না। ভদ্রা কাঁদিতেছে,—সহসা মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুত হইল। ভদ্রা বারান্দায় আসিয়া দেখিল অর্জ্জুন আসিতেছেন, ভদ্রার কান্না গেল, আসিল অভিমান। ভদ্রা গৃহে আসিয়া ময়ূর সিংহাসনে উপবেশন করিল; কেশপাশে মুখ আচ্ছন্ন, এমন সময়ে অর্জ্জুন আসিলেন। ভদ্রা কোন সম্ভাষণ করিল না। অর্জ্জুন ডাকিলেন "ভদ্রা!" ভদ্রা কোন উত্তর করিল না। অর্জ্জুন নিকটে গিয়াছেন, অর্জ্জুন হস্ত ধরিতে যান, ভদ্রা হস্ত ছুড়িয়া ফেলিল, অর্জ্জুন প্রথমে বিলম্বের কারণ বলিলেন, নানা প্রকার কাতরোক্তি করিলেন, তথাপি ভদ্রা দ্রব হইল না। প্রায় কৃষ্ণসখার শেষ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবার মত হইল 'দেহি পদপল্লবমুদারম্।' ভদ্রা অর্জ্জুনের নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ছিছি আমি এত ক্লেশ পাই আর তুমি ত বেশ নিশ্চিন্ত! তুমি আমায় ভাল প্রেম শিক্ষা দিয়াছ!

অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—তার এখনও বিলম্ব আছে। ভদ্রা! এখনও তুমি ভাল করিয়া "আমি তোমার" সাধনা কর নাই, আমি আপনি আচরণ করিয়া এ সাধনায় তোমাকে সিদ্ধি দিব, তখন আত্মসুখেচ্ছা পতি-সুখেচ্ছায় পরিণত হইবে। ভদ্রার অভিমান এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই? অর্জ্জুন তখন ভাল করিয়া "আমি তোমার" "তুমি আমার" এবং "তুমিই আমি" ভালবাসার এই তিন অবস্থা বুঝাইলেন। অন্ধ হৃদয় চক্ষুষ্মতী বুদ্ধির আলোক পাইল।

ভদ্রার অভিমান গিয়াছে। ভদ্রা বলিল, দেখ আমায় যেমন গড়িবে আমি সেই রূপই হইব, কখন তোমার ইচ্ছার বিরোধী হইব না, তুমি এমন শিষ্যা পাইবে না। ভদ্রা তখন বড় শান্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকটে উপবেশন করিলেন।

অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন এই যে কত কি বলিতেছিলে?

ভদ্রা। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আর কাহাকে বলিব? আমি হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে পারি নাই। তুমি আমায় বলিয়া দাও কি করিলে আমি তোমার দাসী হইতে পারি, কি করিলে "আমি" "আমার" বলিতে যাহা আছে তাহাই তোমাকে দিয়া তোমার চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিতে পারি। পূর্ণ ভাবে তোমার হই এই আমার বড় আকাঙ্ক্ষা।

অর্জ্জুন। তাহাই হইবে। আমি তোমায় মনের মত করিয়া গড়িব। তখন দুই জনে সীতার কথা পাড়িলেন। অর্জ্জুন সীতার আদর্শ জ্বলন্তভাবে ভদ্রার সম্মুখে ধরিলেন। ভদ্রা বড় মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল।

এদিকে সত্যভামা গোবিন্দের নিকটে দিন দিন নানা আশঙ্কার কথা তুলিতেছেন। দৈবকী ও রোহিণীর সহিত

বলভদ্রের উত্তর প্রত্যুত্তর শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই শুনিয়াছেন। গোবিন্দ পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিতেছেন "তোমার ভয় কি আমি ইহার বিধান করিব। এখনও দুর্য্যোধনের আসিতে বিলম্ব আছে। তুমি দূতী পাঠাইয়া অন্য একবার ধনঞ্জয়কে এখানে আনয়ন কর।"

সত্যভামা দূতী পাঠাইলেন না। কি জানি যদি কেহ পার্থ ও ভদ্রাকে এক সঙ্গে দেখে, যদি একথা রামকে কেহ বলিয়া দেয়। সত্যভামা আপনি চলিলেন।

যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। অর্জ্জুন সুভদ্রার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। কোন দুশ্চিন্তার ছায়াও সেখানে পহুঁছায় নাই। সত্যভামা ভদ্রা ও অর্জ্জুনকে বড় নিশ্চিন্ত দেখি-লেন। ক্ষণকালের জন্য উভয়ের বুক ভরা সুখ দেখিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। পরে কি ভাবিয়া পার্থকে বলিলেন—এই যে প্রমাদ উপস্থিত তুমি কি ইহার কিছুই জাননা ?

অর্জ্জুন। কিসের প্রমাদ দেবি! তোমার পাদপদ্ম যাহার আশ্রয় তাহার কি আর প্রমাদ আছে ?

সত্যভামা অর্জ্জুনকে কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানাইলেন। তখন উভয়ে কৃষ্ণের নিকটে আসিলেন।

কৃষ্ণ সখার হাত ধরিয়া পালঙ্কে বসাইলেন, বলিলেন সখা! সুভদ্রাকে তোমায় সমর্পণ করিতে পিতার ইচ্ছা, কিন্তু বলভদ্রের ইচ্ছা দুর্য্যোধনকে দিতে। বলভদ্র হস্তিনাপুরে দূত পাঠাইয়া দুর্য্যোধনকে সংবাদ দিয়াছেন। দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ কিন্তু আপন ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কথা কিছুই বলিলেন না।

অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে সুভদ্রা দানের কথা শুনিয়া ভিতরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন বলিলেন সখা! এই সামান্য বিষয়ে তোমার

চিন্তা কি? তোমার প্রসাদে আমি ত্রিভুবন জয় করিতে পারি, তোমার প্রসাদে মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয়কেও ডরাই না। দেখিব হলধর কত শক্তি ধরেন। আমি সকলের সাক্ষাতে সুভদ্রা লইয়া যাইব।

কৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন—দ্বন্দ্বে প্রয়োজন নাই, তুমি সুভদ্রাহরণ করিও। তুমি মৃগয়াজন্য আমার রথে চড়িয়া যাইও আমি সুভদ্রাকে রৈবতক প্রদক্ষিণ জন্য পাঠাইব; তুমি সুভদ্রাকে হরণ করিও, শেষে রামকে শান্ত করিব।

সত্যভামা শান্ত হইলেন। পরামর্শ ঠিক হইল। পরদিন প্রাতঃকালে অর্জ্জুন স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া ভাবিলেন রামের সহিত যুদ্ধ বাধিতে পারে এ কার্য্যে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি আবশ্যক।

অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে এক দূত প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজকে জানাইলেন যাহা যাহা ঘটিয়াছে। যথা সময়ে দূত সংবাদ লইয়া আসিল।

যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর দিলেন—"পাণ্ডবের বলবুদ্ধি, পাণ্ডবের সখা, স্বয়ং নারায়ণ। তাঁহার মত লইয়া তুমি কার্য্য করিও"। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইয়া বিশেষ তুষ্ট হইলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধনের আয়োজন।

গান্ধর্ব্ব সম্প্রদানের রাত্রি হইতে সপ্তনিশা অতিবাহিত হইয়াছে। হস্তিনাপুরে যখন ভদ্রার বিবাহের কথা উঠিল, যখন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি শুনিলেন দুর্য্যোধন কৃষ্ণের ভগিনী-পতি হইবে তখন তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। চারিদিকে কথাটা ছড়াইয়া পড়িল। চারিদিকে বড় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। এখানে সেখানে পাঁচজনে একত্র হইয়া বিচার করিতে লাগিল, দুর্য্যোধন আর পাণ্ডব হইতে ভীত হইবেন না। কৃষ্ণ পূর্ব্বে পাণ্ডবের সহায় ছিলেন এখন কিন্তু দুর্য্যোধনের আত্মীয় হইলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ সকলেই এই কথা শুনিলেন কিন্তু মনে মনে নানা কথা উঠিতে লাগিল। দ্রোণ বিশ্বাস করিলেন কিন্তু বলিলেন কৃষ্ণের আবার কুটুম্ব কি? তাঁহার আবার পরাপর কি? যে তাঁহার ভক্ত তিনি তাঁহারই।

বিদুর ও কৃপাচার্য্য বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন—গোবিন্দ ত দুর্য্যোধনের উপর সন্তুষ্ট নহেন, এবিবাহ যে হইবে এরূপ মনে হয় না। তাঁহারা সকলে গোপনে দূতকে প্রকৃত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

দূত বলিতে লাগিল পার্থ দ্বারকাতে আছেন, গোবিন্দের ইচ্ছা তাঁহাকে সুভদ্রা দান করেন, বসুদেবেরও ইচ্ছা সেইরূপ কিন্তু কেবল বলভদ্র এ বিবাহে অমত করিয়াছেন। পশ্চাতে কি হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই।

ভীষ্ম সমস্ত শুনিয়া বলিলেন এ বিবাহে দুর্য্যোধন লজ্জা পাইবে। এদিকে দুর্য্যোধন ভারি একটা আয়োজন করিয়া বসিল।

দেশ বিদেশ হইতে বন্ধুবান্ধবদিগকে আনাইতে লাগিল, ভারে ভারে বিবাহ সামগ্রী আসিতে লাগিল। আবার এদিকে ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে নিমন্ত্রণ পত্র গেল, দুর্য্যোধনের পত্রে পাণ্ডবের উপর একটু কটাক্ষও ছিল।

ধর্ম্মরাজ কিছু বিস্মিত হইলেন। সহদেবকে ডাকাইলেন জিজ্ঞাসা করিলেন 'অর্জ্জুন পূর্ব্বে ভদ্রার বিবাহের বৃত্তান্ত জানাইয়াছেন এখন আবার দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণ করিতেছে, কথাটা অনর্থের মত লাগিতেছে, সহদেব! বল দেখি ইহা কেমন হইবে?' সহদেব গণনা করিলেন বলিলেন সাত দিন হইল ভদ্রার সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণের আজ্ঞায় সত্যভামা লুকাইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন; বলভদ্র কিছুই জানেন না, অন্য যাদবেরাও জানে না, দুর্য্যোধন রামের আদেশে যাইতেছে।

যুধিষ্ঠির আশঙ্কা করিলেন। "বড় লজ্জার কথা, এ বিবাহে আমার যাওয়া উচিত নয়"।

যুধিষ্ঠির বরযাত্র হইয়া গমন করা স্থগিত করিলেন কিন্তু ভীমসেনকে সসৈন্যে যাইতে আদেশ করিলেন। রাজার আজ্ঞায় ভীম পাঁচ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধন বর সাজে সাজিয়াছে। রত্নময় চতুর্দ্দোল, নগর যুড়িয়া বাদ্য বাজনা, হয়, হস্তী, গণনা করা যায় না, মহা সমারোহ করিয়া দুর্য্যোধন চলিয়াছে। ভীম সমস্তই জানেন, ইচ্ছা একটু রঙ্গ দেখি, বলিলেন এখান হইতে দ্বারকা বহুদুর, এখন হইতে বরবেশে কেন? নিকটে গিয়া সাজসজ্জা করাই ত ভাল, বিশেষ বরের ত বয়স হইয়াছে।

"ইহাতে দোষ কি" দুঃশাসন এই উত্তর দিল। আরও বলিল "যদি দেখিতে না পার পশ্চাতে আইস।"

বৃকোদরের উদরে কথা থাকে না। ভীম বলিতে লাগিলেন "ভালমন্দ শীঘ্রই বুঝিবে। কোন্ কন্যার বিবাহ জন্য বর বেশে যাইতেছ শেষে বুঝিবে। আজ তিন দিন হইল তোমাদের নিকটে দূত আসিয়াছে, কিন্তু আজ সপ্তাহ হইল ভদ্রার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; বৃথা সভা মধ্যে গিয়া লজ্জা পাইবে; সেইজন্য সৎপরামর্শ দিতে ছিলাম বর বেশে গিয়া কাজ কি? আর ঐ যে বলিতেছ "পশ্চাতে আইস" পশ্চাতে পড়িতে ভীমসেন জন্মগ্রহণ করে নাই। পশ্চাতে যাইব কেন সর্ব্বাগ্রে যাইতেছি।" ভীম সসৈন্যে সর্ব্বাগ্রে চলিল।

ভীমের বাক্যে শকুনি কর্ণ দুর্য্যোধন কাণাঘুসা করিতে লাগিল। ভীষ্ম দ্রোণ কথাটার আভাস পাইলেন। দুঃশাসন সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর, বুদ্ধিতে খলযুক্তির উদয় হইল। বলিল ভীম চিরদিন হিংসুক, বরবেশ দেখিয়া হিংসা হইতেছে তাই বাতুলের মত যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। দুঃশাসনের বাক্যে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের মনের সংশয় দূর হইল। মানুষ একবারে অধার্ম্মিক হইতে পারে না, সত্ত্বগুণ একা থাকে না; অধার্ম্মিক হইলেও সময়ে সময়ে মনস্থির হয়; কিন্তু অসতের পরামর্শে তৎক্ষণাৎ মনের স্থিরত্ব নষ্ট হয়; তখন মন অধর্ম্মের দিকে প্রবল বেগে ছুটিয়া আইসে, ইহাতে অধার্ম্মিক বড়ই হৃষ্ট হয়।

দুর্য্যোধন আপন গুরু বলভদ্রকে সংবাদ পাঠাইলেন। অগ্রহায়ণ প্রথম তৃতীয়ার শেষ রোহিণী নক্ষত্র বেলা দ্বিতীয় প্রহরে আমরা উপস্থিত হইব। আজ রাত্রিতে যেন কন্যার অধিবাস হয়; আগামী কল্য বিবাহের শ্রেষ্ঠ লগ্ন জানিবেন। বলভদ্র পত্র পাইয়া ভদ্রার গন্ধ অধিবাস আজ্ঞা দিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

সুভদ্রা হরণ।

বলভদ্রের আজ্ঞায় সুভদ্রার অদ্য গাত্র হরিদ্রা। বহু নারী তৈল হরিদ্রা আমলকী প্রভৃতি গন্ধ মাখিতে বসিয়া, গেল। মাখা শেষ হইলে সকলে রৈবতক নিকটবর্ত্তী নদীতে স্নান করিতে যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে ইঙ্গিত করিলেন। বহু যুবতী ভদ্রা সঙ্গে স্নান করিতে গমন করিল, সঙ্গে সঙ্গে বাদক ও রক্ষকগণ চলিল।

অর্জ্জুন পূর্ব্ব হইতে সমস্ত আয়োজন করিয়া আছেন; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গোপনে বলিলেন—সখা! শুনিতেছ দুর্য্যোধন আসিতেছে, অদ্য অধিবাস, কল্য বিবাহ, ভদ্রাকে স্নানার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে, তুমি মৃগয়াচ্ছলে আমার রথে আরোহণ কর; ভদ্রা যখন রৈবতক প্রদক্ষিণ করিবে তখন তুমি তাহাকে হরণ করিও।

কৃষ্ণ তখন দারুককে ডাকাইলেন। দারুক রথ সজ্জীভূত করিল। কৃষ্ণ বলিয়া দিলেন যেখানে রথ লইতে বলিবে তুমি সেইখানে লইয়া যাইও।

অর্জ্জুন তখন খড়্গ কবচ গোধা অঙ্গুলিত্রাণ প্রভৃতি ধারণ করিয়া রথে উঠিলেন। রথ শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বযুক্ত কিঙ্কিণীজালমালাবিভূষিত প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য। অর্জ্জুন রথে উঠিবা মাত্র রথ জলদগম্ভীর শব্দে রাজমার্গে গমন করিল, দেখিতে দেখিতে রথ অদৃশ্য হইল।

সুভদ্রা শৈলরাজ রৈবতকের অর্চ্চনাপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন, দেবগণের পূজা করিলেন, ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া

অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময়ে অর্জ্জুনের রথ আসিল, অর্জ্জুন তখন ধীরে ধীরে রথ হইতে অবতরণ করিলেন। সভাপালেরা এবং সৈন্য সামন্ত সকলেই অর্জ্জুনকে অভিবাদন করিল। যাদবীগণ সকলেই অর্জ্জুনকে জানিত, কেহ বুঝিল না অর্জ্জুনের অভিপ্রায় কি—বুঝিল কেবল সত্যভামা ও সুভদ্রা।

সুভদ্রা দ্বারকাভিমুখে, আর রথ চলিতেছিল রৈবতকের দিকে। অর্জ্জুন ধীরে ধীরে পদব্রজে যাদবীগণের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভদ্রা সর্ব্বাগ্রে, অর্জ্জুন একবারে চারুসর্ব্বাঙ্গী ভদ্রার হস্ত ধরিয়া বিদ্যুৎবেগে রথে উঠিলেন। দারুককে বলিলেন ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রথ চালাও। হিরণ্ময় রথ ইন্দ্রপ্রস্থ মুখে ছুটিল।

বড় একটা কোলাহল উঠিল। যাদবীগণ চিৎকার করিয়া উঠিল। শতমুখে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সৈনিকেরা ধর্ ধর্ শব্দে ছুটিল, সভাপালগণ অর্জ্জুনকে গালি দিতে লাগিল বলিল আরে পার্থ! তোর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে, নিশ্চয় তোর মৃত্যু নিকট নতুবা এই রামকৃষ্ণরক্ষিত যদুবংশে চুরি করিতে তোর প্রবৃত্তি হইবে কেন? রে দুষ্ট! কাপুরুষের মত চোরের মত পালাইতেছিস্ কেন? ফের্ যুদ্ধ দে।

শৃগালের চীৎকারে সিংহ গ্রীবা বক্র করিয়া দেখিল। অর্জ্জুন ফিরিলেন। সভাপালগণ অর্জ্জুনের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিল, অর্জ্জুন শুধু রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। ক্রমে ক্রোধের সঞ্চার হইল,—অর্জ্জুন বহু সভাপাল বিনষ্ট করিলেন। অর্জ্জুন আবার রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন।

দেখিতে দেখিতে সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। বলভদ্রও শুনিলেন, বলভদ্র ক্রোধে অস্থির হইলেন। ভদ্রার সহোদর সারণ, কৃষ্ণপুত্র কাম, শাম্ব, গদ প্রভৃতি যদুবালকগণ

কুপবৃন্দ, উপগদ, উগ্রসেন, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যদুবীরগণ অক্ষৌহিণী যাদব সেনা সমভিব্যাহারে সজ্জিত হইলেন, হলধর একেবারে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়াছেন, দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া বলিতেছেন "আজ পাণ্ডব বংশ নির্ব্বংশ হইল। আমি দুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, দুর্য্যোধন বুরবেশে সাজিয়া আসিতেছে আর আমার এই অপমান! আরে পাণ্ডব! কোথায় গিয়া তুই রক্ষা পাইবি? এত স্পর্দ্ধা তোর হইয়াছে।" ক্রোধে বলভদ্রের চক্ষু ঘূর্ণিত হইতেছে, শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। অঙ্গতাড়নে গলার মালা ছিঁড়িয়া পড়িল। বলদেব পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন "হতভাগ্য! কুক্কুর হইয়া যজ্ঞের হবি ইচ্ছা করিয়াছ, নির্লজ্জ, চণ্ডাল হইয়া আমার ভগিনী লাভ বাসনা? কালসর্প গলায় বাঁধিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা? এখনই ইহার প্রতিফল পাইবি। আর কৃষ্ণের কি বিচার? এমন পাণ্ডবকে অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছিল, যে পুরে শমন প্রবেশ করিতে শক্তি ধরে না, যে পুরে চন্দ্র সূর্য্যের প্রবেশাধিকার নাই, যে পুরে বায়ু প্রবলবেগে বহিতে ভয় করে, আজ পাপিষ্ঠ সেই পুরমহিলা অপহরণ করিয়াছে। রে পাণ্ডব! আজ আমার ভগিনী হরণ করিয়া তুই কোথায় পলায়ন করিবি? আমি পৃথিবী খুঁজিয়া তোরে বিনাশ করিব। পাণ্ডববংশে বাতি দিতে কাহাকেও রাখিব না, আর ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের যে কেহ তোরে আশ্রয় দিউক, আজ আমার শত্রুকে রক্ষা করিতে কাহারও শক্তি হইবে না। কৃষ্ণ আজ সমুচিত শাস্তি পাইয়াছে। সখা সখা করিয়া কৃষ্ণ অজ্ঞান। অন্তঃপুরে স্থানদান। এখন কৃষ্ণ আসিয়া দেখুক তাহার সখার কর্ম্ম।

জ কৃষ্ণ যে স্নেহ দেখাইল তার সমুচিত ফল দিয়াছে, ভগিনী

হরণ করিয়া মুখে চুণ কালি দিয়াছে, নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক ঢালিয়া দিয়াছে। আমি আর কাহারও মুখের দিকে তাকাইতে পারি না।”

হলধর তখন যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইলেন। বাম হস্তে লাঙ্গল দক্ষিণ হস্তে মুষল ধারণ করিলেন। সকল সেনাপতিকে আজ্ঞা দিলেন ‘অর্জ্জুনকে বাঁধিয়া আন’, আর কৃষ্ণকে ডাকিতে দূত পাঠাইলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? রণোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া বহুসৈন্য-সামন্ত সঙ্গে যদুবালকগণ বাহির হইল। যাদব মাত্রেই ব্যস্ত, কিন্তু কৃষ্ণ কোথাও নাই, আর যাদবীগণ যেখানে হাহাকার করিতেছে, সেখানে সত্যভামা নাই। সাত্যকি প্রভৃতি বীর-গণের মনে সন্দেহ হইল, যেন কৃষ্ণ আজ্ঞা ভিন্ন, বলদেব আজ্ঞায় প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল না; বাহিরে সকলেই নিজ নিজ শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইতে ব্যস্ত। তত বেশী কৃষ্ণের অনুসন্ধান হইল না। বলদেব সকলকে আজ্ঞা দিয়া কৃষ্ণের অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

এ দিকে গদ, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, সারণ প্রভৃতি যাদবগণ রথা-রোহণে অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ছুটিয়াছে। বাদ্যধ্বনি করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে, অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিতেছে, চোর বলিয়া গালি দিতেছে।

অর্জ্জুন রথের গতি মন্দ করিতে বলিলেন। যদুগণের গর্ব্বিত বাক্য অর্জ্জুনের কর্ণে প্রবেশ করিল, অর্জ্জুন আর থাকিতে পারিলেন না, দারুককে বলিলেন “রথ ফিরাও।”

দারুক বড় বিপদে পড়িল। কৃষ্ণরথে চড়িয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণ-পুত্রদিগকে প্রহার করিবে, দারুক ইহা কি সহ্য করিতে পারে?

দারুক যোড়হস্তে বলিল পার্থ! একি অদ্ভুত কথা কহিতেছ? গোবিন্দের পুত্র গোবিন্দের অধিক, ইহাদের পরাক্রম অপরিমিত, ইহারা ত্রৈলোক্যে অজেয়। দেখ যেন প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় ইহারা গর্জ্জিয়া আসিতেছে। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত বিবেচনা করি না, এ কর্ম্মে আমার শক্তি নাই। অন্য যেখানে বলিবে আমি সেখানে রথ চালাইব কিন্তু রথ ফিরাইতে পারিব না। যাদব হইয়া যাদবের সহিত যুদ্ধ করাইব? কৃষ্ণসারথি হইয়া কৃষ্ণরথে চড়িয়া কৃষ্ণপুত্রসঙ্গে সংগ্রাম করাইব? আমি রথ ফিরাইতে পারিব না।

দারুকের পরামর্শে বীরধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইল না, ক্ষত্রিয়ের আহ্বানকারীর সহিত যুদ্ধে প্রতিজ্ঞা প্রতিনিবৃত্ত হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হইল না।

অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন—শুন দারুক! এ ব্যবহার ক্ষত্রিয়ের নহে। আমি ক্ষত্রিয়, আজ যুদ্ধের জন্য আমাকে পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিতেছে, বিশেষ ইহারা স্পর্দ্ধা করিয়া আসিতেছে, ক্ষত্রিয়ের অংযশ অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে শ্রেয়স্কর। এ অপযশ তুমি আমায় কিনিতে বল? শৃগালের মত আমি—ধনঞ্জয়—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইব? কৃষ্ণপুত্রের কথা কি বলিতেছ, যদি স্বয়ং কৃষ্ণ আইসেন, যদি যুধিষ্ঠির, ভীম, ইহাঁরাও যুদ্ধের জন্য আমায় আহ্বান করেন, যে কেহই হউক না কেন যুদ্ধের জন্য যদি আহ্বান করে, আমি ফিরিব না। তুমি রথ ফিরাও।

দারুক কি করিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অর্জ্জুন দারুককে অবিশ্বাস করিলেন। প্রবোধবাড়ী ও কড়িয়ালি কাড়িয়া লইলেন, আপন রথের দক্ষিণ পার্শ্বে রথস্তম্ভে

দারুককে পাশ অস্ত্রে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। আপনি অশ্ব-বল্‌গা ধারণ করিয়া রথ ফিরাইলেন। নিমেষমধ্যে অর্জ্জুন এক পদে কড়িয়ালি ধারণ করিলেন, অন্য পদে প্রবোধবাড়ী ধরিলেন, দুই হস্তে তীরধনু গ্রহণ করিলেন।

ভদ্রা এতক্ষণ বধূবেশে ছিল। অর্জ্জুনের ক্লেশ দেখিয়া ব্যথিত হইল। সাহায্যার্থ ভদ্রা প্রস্তুত হইল।

বঙ্গের খ্যাতনামা উপন্যাসলেখক সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষে এই ছবি আঁকিয়াছেন। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের সঙ্গে এইরূপ একটা অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন, পারেন নাই। আজ কাল বুঝি বঙ্গদেশেও ইহা অসম্ভব নহে। যাহা হউক সে দৃশ্য কিন্তু সুন্দর। আর কাশীরামের এ চিত্র বড়ই সুন্দর।

ভদ্রা অর্জ্জুনকে বলিতেছে, আমি রথ চালাইতে জানি এত ক্লেশ কেন? এই রথে আমি সত্যভামা সঙ্গে কতবার কতদেশ ভ্রমণ করিয়াছি। সত্যভামা স্নেহ করিয়া আমায় সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন, আমি এই রথের সারথি হইয়া কতবার রথ চালাইয়াছি, কৃষ্ণ আমার রথ চালনা দেখিয়া কতবার সুখ্যাতি করিয়াছেন।

অর্জ্জুন সহাস্যে ভদ্রার হস্তে কড়িয়ালি প্রদান করিলেন। ভদ্রা বড় উৎসাহে আপন নৈপুণ্য প্রকাশ জন্য উদ্যম করিল।

এ ইচ্ছা বড়ই স্বাভাবিক। আপন নৈপুণ্যের পরীক্ষা দিবার সুবিধা হইয়াছে বলিয়া ভদ্রা আপনাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল।

ভদ্রার সারথ্যে রথ বায়ুবেগে ছুটিল। রথ কখন আদিত্য-মণ্ডলে কখন সৈন্যমণ্ডলীর চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে, কখন দেখা যাইতেছে, কখন অদৃশ্য হইতেছে, মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের খেলার মত ভদ্রা কখন চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে কখন অস্তমিত হইতেছে,

সকলে অবাক হইয়া দেখিতেছে, জলধরজড়িত বিদ্যুতের তেজ অদম্য।

যুদ্ধ হইল। যদুবীরগণ আর সহ্য করিতে পারিল না। অনেক সৈন্য হত হইল। সকলে বলভদ্র ও কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইল। পরামর্শ করিয়া বলভদ্রের নিকট দূত প্রেরণ করিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নিবৃত্তি।

বলভদ্র কতক্ষণ উৎকণ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণের অপেক্ষা করিলেন। এ বিপত্তিকালে মধুসূদন কোথায়? মেঘ হইতে মেঘান্তরে বিদ্যুতের গতি যেরূপ হয়, সেইরূপে যেন কৃষ্ণ হৃদয় ছুটিয়া গেল। মনেও যেন সংশয় উপস্থিত হইল. কিছুই নিশ্চয় হইল না। ভদ্রাকে অর্জ্জুন হরণ করিয়াছে, আবার স্মরণ হইল, ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল! বলভদ্র বিলম্ব করিতে পারিলেন না, একেবারে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন।

এমন সময়ে দূত আসিয়া সংবাদ দিল "প্রভো! অর্জ্জুনের হাতে বুঝি সব নষ্ট হয়।" দূত আরও বলিতে লাগিল "দেব! আরও এক অপূর্ব্ব দেখিলাম অর্জ্জুনের রথ চালাইতেছে ভদ্রা। এমন নৈপুণ্য আর কোথাও দেখি নাই। এই দেখি রথ সৈন্য মধ্যে পরক্ষণেই আর দেখা যায় না, যেন শূন্যে উঠিয়াছে, যেন মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত হইল। পার্থ যুদ্ধ করিতেছে কিন্তু এক-স্থানে স্থির নাই, একটা প্রবল তেজে মৎস্য যেমন জল মধ্যে বিচরণ করে সেইরূপ সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে, কোন্ স্থানে থাকিয়া বাণ প্রয়োগসংহার করিতেছে তাহার স্থির নাই। যুদ্ধে বহু সৈন্যক্ষয় হইল। কেহই আর পার্থের যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। কুমারগণ ব্যাকুল হইয়া আপনার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছেন।"

"ভদ্রা রথ চালাইতেছে।" বলভদ্রের মন বিশেষ আন্দোলিত। কৃষ্ণও নাই। বলভদ্র ভাবিতেছেন একি হইল! "দূত!" বলভদ্র বলিতে লাগিলেন "এমন রথ পার্থ পাইল কোথায়?"

দূত সভয়ে উত্তর দিল প্রভো! এ রথ মহারাজের। রথে সুগ্রীবাদি অশ্ব। আরও দেখিলাম দারুক বন্ধন অবস্থায় রথে রহিয়াছে।

বলরাম সমস্তই বুঝিলেন। যুদ্ধ করিব কাহার সঙ্গে? যুদ্ধোদ্যম শিথিল হইল; বলভদ্র হেঁটমুখে ভূমিতলে উপবেশন করিলেন! অভিমানে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণের কাছে বলভদ্র মন্ত্রমুগ্ধফণিবৎ। বুঝিলেন এ ব্যাপারের মূলে চক্রধারী। হারিলেই লোক কাঁদে। বলভদ্র হারিয়াছেন, চক্ষুর জল কিছুতেই নিবারণ হইতেছে না। বলভদ্র বলিতেছেন, গোবিন্দ আমায় অপমান করাইতেছে। আপনার সারথি, আপনার রথ, আপনার অশ্ব, অর্জ্জুনকে দিয়াছে; অর্জ্জুনের শক্তি কোথায় এরূপ কার্য্য করে? আমি না বুঝিয়া অর্জ্জুনকে দোষ দিলাম। আমার সমক্ষেই গোবিন্দ কপট বলিল, আর সে আমায় মুখ দেখাইবে কি প্রকারে? দুর্য্যোধনকে আমি বিবাহের জন্য নিমন্ত্রণ পত্র দিয়াছি অধিবাসের জন্য ব্রাহ্মণ উপস্থিত। ছি ছি গোবিন্দ আমায় অপমান করিতেছে।

বলভদ্র হাতের লাঙ্গল দূরে ফেলিলেন, মূষল দূর করিলেন, অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিলেন। নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া অধোমুখে নিরাসনে উপবেশন করিয়াছেন।

কৃষ্ণ আসিলেন। দামোদর একবারে ভূমে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অভিমান ভাঙ্গিল না। ক্রোধে অভিমানে বলদেব কৃষ্ণের দিকে তাকাইলেন না।

নীলগিরি আজ রজতগিরির নিকটে কৃতাঞ্জলি। কৃতাঞ্জলি হইয়া গোবিন্দ বলিতেছেন প্রভো! দাস আজ কোন্ অপরাধে অপরাধী, কেন আজ এই ক্রোধ?

বলরাম কোন কথা কহিলেন না।

উগ্রসেন বলরামের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন। বলিতেছেন, কৃষ্ণ! কি অনুচিত কর্ম্ম তুমি করিয়াছ! পার্থকে ভদ্রা হরণ করিতে বলিয়া দিয়াছ, আপন রথ দিয়াছ, আপন অশ্ব দিয়াছ। তোমার দোষ নয় ত দোষ কার কৃষ্ণ?

গোবিন্দ কৌশল করিয়া বলিলেন, পার্থ ত এই রথে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। আর যদি ভদ্রার ইচ্ছা না ছিল তবে ভদ্রা রথ চালাইতেছে কেন? আমার সারথি দারুকের কোন্ অপরাধ?

কৃষ্ণ তখন দূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দূত! তুমি দারুকের কি দশা দেখিয়াছ বল?

করযোড়ে দূত বলিতে লাগিল প্রভো! দারুক স্ববশে নাই। দারুক রথের স্তম্ভে বন্ধন দশায় অবস্থিত।

কৃষ্ণ তখন সুবিধা পাইলেন, সভাসদ্ সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, সকলে বুঝিয়া দেখুন আমি কতদূর দোষী। অর্জ্জুনের প্রতি যদি ভদ্রার অনুরাগ না থাকে তবে কি রথের সারথি হইয়া রথ চালাইতে পারে?

এত কথাতেও বলদেবের ক্রোধ শান্ত হইল না। কৃষ্ণকুমার-গণ যে দূত পাঠাইয়াছিল, তাহারও কি করিবে নিশ্চয় করিতে পারিল না। আবার দূত আসিল, আবার দুঃখের কথা জানাইল। আমরা যদুবীরগণের বড়ই দুরবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধে কাহারও শরীর অক্ষত নাই। অর্জ্জুন সকলকে পরাভূত করিয়াছে। কাহারও তূণে আর শর নাই, রথ অশ্ব একটীও নাই। হয় আপনি না হয় মহারাজ এ দুইএর কেহ নহিলে অন্য উপায় নাই। দূত আবার বলিল, অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে কুমারগণের সাধ্য নাই। অর্জ্জুন স্নেহের বশীভূত

হইয়া কুমারগণকে সংহার করিতেছেন না নতুবা এতক্ষণ কেহই আসিয়া জীবিত থাকিত না।

কৃষ্ণ আরও সুবিধা পাইলেন, বলদেবকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় কেহই অর্জ্জুনকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবেন না, এত শক্তি কাহারও নাই। এ সমস্ত বালকের কি সাধ্য অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিবে? দূত! তুমি সত্যই বলিয়াছ, স্নেহে অর্জ্জুন কুমারদিগকে বিনাশ করিতেছেন না।

কৃষ্ণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; অর্জ্জুন বিশেষ কিছু অন্যায় করেন নাই। শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয় বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করিবে ইহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশংসনীয়। আর ইহাতে ধনঞ্জয়েরই বা দোষ কি? প্রভো! একবার ভগিনীর কথা বিচার করুন। যদি অর্জ্জুনের প্রতি তাহার অনুরাগ না ছিল তবে কি আজ সে লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া যাদবদিগের সমক্ষে অর্জ্জুনের সারথ্য করিতে পারে? প্রভো! আরও দেখুন ধনঞ্জয় কি আপনার বলবীর্য্য জানে না? আপনি তাহার বলদর্প নিমেষমধ্যে চূর্ণ করিতে পারেন; কিন্তু দেব! ইহাতে অধিক আর কি হইবে? জীবন থাকিতে অর্জ্জুন হটিবে না। আপনি অধিক করেন তবে তাহাকে প্রাণে মারিবেন, তখন কি ভদ্রা বাঁচিবে? প্রভো! বলুন ইহাতে কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে?

একে চক্রধারী তার উপর কৌশল। এই বাক্যজালে কার্য্যোদ্ধার হইল। শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে সময় বুঝিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, আমার মতে এক পরামর্শ আছে যদি সকলের মত হয়, আমি বলিতে পারি। কোন প্রিয়-ভাষী দূত গিয়া প্রিয়-বাক্যে পার্থকে ফিরাইয়া আনুক, আর প্রীতির

বলরা

সহিত তাহাকে ভদ্রা সমর্পণ করা হউক। ইহাতে সকলের মঙ্গল হইবে, সম্মানও বজায় রহিবে।

হলধরের ক্রোধ গেল, অভিমান কিন্তু যায় নাই। বড় মর্ম্মপীড়িত হইয়া হলধর বলিতে লাগিলেন—আমার মত কেন জিজ্ঞাসা? গোবিন্দ! যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই হইবে, যাহা তোমার মনে আছে তাহাই কর। যাহা তুমি করিবে কার সাধ্য তাহার অন্যথা করে? তোমার বাক্য যদি আজ অবহেলা না করি তবে কি এই দুঃসহ লজ্জা আমি পাই?

সত্য কথা, তাঁহার পরামর্শ না লইয়া আমরা বড় কষ্ট পাই। যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে আমার অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে কেন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হয় না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি উত্তর দিয়া থাকেন। তিনি দেখা না দিয়াও সুপথে চালিত করেন। হায়! যদি মানুষ সকল প্রকার দুঃখে সকল প্রকার বিপদে একবার স্থির হইয়া একান্তে জিজ্ঞাসা করে 'বল ঠাকুর! এখন আমি করি কি? আমি ত এই বিপদে পড়িয়াছি। তখন সর্ব্ব বিপদের পরিত্রাতা, সংসারসাগরের কর্ণধার সত্য সত্যই বিপদ খণ্ডন করিয়া দিয়া থাকেন। এ কথা ত্রিসত্য, ইহার পরীক্ষা সকলেই করিতে পারেন। এ সত্য সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এ সত্য যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার কাছে মৃত্যু সংসারের বিভীষিকা নাই।

বলভদ্র শান্ত হইয়াছেন। তখন বলভদ্র অর্জ্জুনকে আনিতে সাত্যকিকে প্রেরণ করিলেন।

সাত্যকি বড় আনন্দে অর্জ্জুনের নিকট যাইতেছেন—সাত্যকি বিনা অস্ত্রে অর্জ্জুনের নিকট গিয়াছেন, অর্জ্জুন নিরস্ত্র হইলেন

যুদ্ধ থামিল, কিন্তু সেইকালে দুর্য্যোধনের সৈন্যসামন্ত আসিয়া যদুসৈন্যের সহিত যোগ দিল।

দুর্য্যোধন বরসাজে সাজিয়া আসিয়াছে, দুর্য্যোধন লোকমুখে সমস্ত শুনিল। ক্রোধে, অপমানে, দুর্য্যোধন গর্ গর্ করিতেছে, মর্ম্মাহত হইয়া বলিতেছে—হে কৃপ! হে আচার্য্য! হে পিতামহ! আপনারা পাণ্ডুপুত্রের কার্য্য দেখুন। যে কন্যার নিমিত্ত রাম আমাকে আনাইলেন, দুষ্ট কুন্তীপুত্র তাহাকে হরণ করিয়াছে, আমার দোষ ইহাতে কি আছে! আজ আমি পাণ্ডুপুত্রকে বিনাশ করিব, দেখি কে আজ তাহাকে রক্ষা করে?

কর্ণ তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বলিল মহারাজ! অনুমতি হয় তবে আমি অর্জ্জুনকে হাতে গলে বাঁধিয়া আপনার নিকট আনয়ন করি।

দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল। কর্ণ বাঁধিয়া আনিতে চলিল। দুইপদ অগ্রসর হইতে না হইতে বৃকোদর বাধা দিল। চীৎকার করিয়া ভীম বলিতে লাগিলেন—'আরে রে সূতপুত্র! এ বড় অদ্ভুত কথা শুনিলাম। সুরাসুর যক্ষ রক্ষ যাহার নামে ভীত, সেই অর্জ্জুনকে তুই বাঁধিবি? আরে মূর্খ! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার সাক্ষাতে তোর এত দর্প! আজ যদি আমার হাতে তোর প্রাণ থাকে তবে না তুই পার্থ সঙ্গে যুদ্ধ করিবি? আয় এই দণ্ডেই তোর সমর-সাধ মিটাইব।' ভীম রথ হইতে একলম্ফে ভূতলে পড়িলেন, কালান্তক যমের ন্যায় গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে কর্ণকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমাদ গণিলেন। যুদ্ধ বাধিতে বাধিতে বাধিল না, ভীষ্ম পরামর্শ দিলেন, দুর্য্যোধন! যিনি তোমায় বরণ করিয়া

আনিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনা আপনি বিবাদ করায় কোন্ ফলোদয় হইবে?

দুর্য্যোধন পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। দুর্য্যোধন দ্বারকা অভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময়ে সাত্যকি আসিলেন। দুর্য্যোধনের পক্ষে সকলে ব্যগ্র হইলেন। সাত্যকি অর্জ্জুনে কি কথা হয় শুনিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব্ হইলেন।

সাত্যকি মধুরবাক্যে পার্থকে সম্বোধন করিলেন। দুর্য্যোধনের সকল আশা নিরাশ হইল।

সাত্যকি বলিতে লাগিলেন—পার্থ! ক্রোধ সম্বরণ কর। কুমারগণ না জানিয়া অপরাধ করিয়াছে, রামকৃষ্ণ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারা তোমায় শান্ত করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন। আজ ভোজ, বৃষ্ণিগণ একত্রে বসিয়া মহানন্দে তোমায় সুভদ্রা অর্পণ করিবেন। এই মুহূর্ত্তেই দ্বারকা আগমন কর।

পার্থ তখন সমরসজ্জা ত্যাগ করিলেন, আর ভদ্রা একবারে কুলবধূ সাজিলেন, কিন্তু একহাত ঘোম্‌টা দিতে পারেন নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য ফিরিলেন—ফিরাইলেন, তত ঘোমটা আসিবে কিরূপে? তবে এমন শান্ত হইলেন যেন কিছুই জানেন না। কত লোকে কত কথা বলিল ভদ্রা শুনিয়াও শুনিল না।

ভদ্রার রঙ্গ দেখিয়া অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিলেন। তখন অর্জ্জুন দারুকের প্রতি চাহিয়া বন্ধনমুক্ত করিতে গেলেন, বলিলেন যেই কৃষ্ণ সেই আপনি ইহার অন্যথা কি? মহাত্মন্! আমার অপরাধ লইবেন না।

দারুক পার্থের মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন, দারুক বলিতে লাগিলেন 'পার্থ! এ আমার বন্ধন নহে, আপনি আমার

ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন। আজ আমাকে বন্ধন না করিলে আমার বড় লজ্জা হইত। আমি আজ রামকে মুখ দেখাইতে পারিতাম না। মহাবীর! আমার এক অনুরোধ আমাকে এই ভাবে রামের নিকট লইয়া চলুন, ইহাতে বলভদ্র আর আমার উপর ক্রুদ্ধ হইতে পারিবেন না।

এ যুক্তি কিন্তু ঠিক হইল না। রাম ভাবিতে পারেন কপট বন্ধন। অর্জ্জুন দারুকের বন্ধন মোচন করিলেন। দারুক রথ চালাইল, রথ নিমেষমধ্যে দ্বারকাভিমুখে ছুটিল।

মহামানী রাজা দুর্য্যোধন মানভঙ্গে বড়ই অপমানিত হইলেন। লক্ষণার স্বয়ম্বরে যতদূর লাঞ্ছিত হইতে হয় হইয়াছিলেন, সুভদ্রা হরণে তাহার অধিক হইল। সকলে হস্তিনাপুরে ফিরিলেন। শুনা যায় দুর্য্যোধন বহুদিন পর্য্যন্ত কুরুসভায় মুখ দেখাইতে পারেন নাই।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বিবাহান্তে।

দ্বারকায় অর্জ্জুন ও ভদ্রার বিবাহ হইয়া গেল। ভারি মহোৎসব কিন্তু আর হইল না। সত্যভামা কুন্তী ও দ্রৌপদীকে আনিতে জিদ্ ধরিলেন। যাদবেরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কোনটিই কার্য্যে পরিণত হইল না। কৃষ্ণের এই দুয়েই অমত। অর্জ্জুনের ব্রহ্মচর্য্য দ্রৌপদীদর্শন জন্য, দ্রৌপদীকে সেই জন্য আনা যায় না। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের আগমনে দুর্য্যোধনের অপমান-বহ্নিতে ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং বলভদ্রেরও অসম্মান করা হইবে সুতরাং তাহাও হইল না।

দ্বারকার লোক লইয়াই বিবাহ উৎসব হইল। বিবাহ শেষ হইল। আমাদেরও মনে হইতেছিল উপস্থিত প্রথামত বিবাহ ঘটনার পরেই উপন্যাসের শেষ করা যাউক। কিন্তু নবীন প্রথা রক্ষা করা কঠিন। প্রাচীনেরা নবীন প্রথার বড়ই নিন্দা করেন। যাহা সনাতন তাহাই প্রাচীন। ঋষিগণ যাহা বলিতেন তাহাতেই দেখাইতেন যে নূতন কিছুই বলা হইল না পুরাতন ঋষিবাক্যই পুনরুল্লেখ করা হইল। পরব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সত্যও সর্ব্বথা সনাতন ও প্রাচীন। যাহা সত্য তাহা চির-নবীন। জিনিষটি প্রাচীনই আবশ্যক তবে বহিরাবরণ—সাজ গোজ বস্ত্রালঙ্কার—যাহা বাহিরের তাহা নবীন রুচি মত সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করিলেও করা যায়।

দশম বৎসর শেষ হইতে চলিল। আজ মাঘ মাস। বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি সুন্দরী বহুদিনের পর

প্রিয় স্পর্শে যেন বড়ই হাসিতেছে। আর দ্বারকায় রৈবতক প্রাসাদে একটি বালিকা বা যুবতী উপবিষ্ট। সম্মুখেই পর্ব্বত। পর্ব্বত গাত্রে নানা প্রকার বৃক্ষ লতা ঝিক্ মিক্ করিতেছে। পক্ষীসকল কেহ বা পক্ষ বিধূনন করিতে করিতে অঙ্গের জল ঝাড়িতেছে কেহ বা পত্র হইতে পত্রান্তরে যে জলবিন্দু পড়িতেছে তাহাতেই গা ভিজাইতেছে। আর বালিকা অনিমেষনয়নে কি দেখিতেছে। কি দেখিতেছে কে বুঝিবে? আজ কিন্তু প্রকৃতির হাবভাব যেন তাহার ভাল লাগিল না। বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু কোথায় যাইবে? আজ দ্বারকার বিশাল রাজঅট্টালিকায় তাহার জন্য যেন একটু স্থান নাই। আজ সত্যভামার অকৃত্রিম স্নেহে যেন তাহার পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। সবে আজ কয় দিন বা বিবাহ হইয়াছে? আজই অর্জ্জুন যাইতে চাহেন।

এখনও ভদ্রা ভাল করিয়া অর্জ্জুনকে দেখে নাই। ভাল করিয়া কথা কহে নাই। কত সাধ ভদ্রার প্রাণে—কত সেবা ভদ্রা জানে—একটি-আধখানি-সাধও এখনও ভদ্রার পূর্ণ হয় নাই। অর্জ্জুন ভদ্রাকে রৈবতক প্রাসাদে আসিতে বলিয়াছেন। ভদ্রা আসিয়াছে।

ভদ্রা আজ বড় গম্ভীর। কৈ সে দিন ত ভদ্রা এত গম্ভীর ছিল না। সে দিন শ্যাম সন্ধ্যায় যখন সকলে আপন আপন তালে নাচিতেছিল—যখন বিদ্যুৎ মেঘের সঙ্গে খেলা লইয়া ব্যস্ত ছিল, যখন তরঙ্গ সমুদ্রবক্ষে উত্থান পতন লইয়া ব্যস্ত ছিল, যখন সুনীল অনন্ত আকাশ তারার হার গাঁথিতে ব্যস্ত ছিল—নৈশ বায়ু ফুল ফুটাইতে ব্যস্ত ছিল, আর দ্বারকাবাসী কৃষ্ণের ক্ষণিক অদর্শনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—তখনও ভদ্রা কি যেন

কি আশঙ্কা করিয়া আপন হৃদয় লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সেই শ্যাম সন্ধ্যাকালে ভদ্রা একাকিনী আপন গৃহে বসিয়া কাঁদিতেছিল, আর অর্জ্জুন নিঃশব্দপদসঞ্চারে ভদ্রার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দ্বাররুদ্ধ করিলেন। ভদ্রা চমকিয়া উঠিল—বলিল এ আবার কি?

অর্জ্জুন—তুমি কাঁদিতেছ? কেন কি হইয়াছে?

ভদ্রা—স্বামীই নারায়ণ—স্বামীই অন্তর্য্যামী—তোমাকেও কি ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে?

অর্জ্জুন—আর তুমি ত কৃষ্ণভগিনী—শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া কি তোমাকেও ভুলাইতে ছাড়িবে না?

ভদ্রা অকস্মাৎ যেন জাগ্রত হইল—স্থিরদৃষ্টিতে ভদ্রা অর্জ্জুনের প্রতি চাহিয়া আছে—হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ। কি যেন একটা পরদা চক্ষু হইতে সরিয়া গেল ভদ্রা দেখিল স্বামী সত্যই নারায়ণ—কিছুই কল্পনা নহে। ভদ্রাগৃহ যেন কি এক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইল। ভদ্রা তখন গলদশ্রুলোচনে সম্মুখবর্ত্তী প্রতি-মূর্ত্তিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল—বালিকাকালের কণ্ঠস্থ স্তব আপনা হইতে উচ্চারিত হইল—ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে ভদ্রা বলিতে লাগিল—

তব চরণসরোজে মন্মনচঞ্চরীটৌ
ভ্রমতু সতত মীন প্রেমভক্ত্যা সরোজে
জননমরণরোগাৎ দেহি শান্তৌষধাজ্ঞে
সুদৃঢ় সুপরিপক্কাং দেহি ভক্তিঞ্চ দাস্যম্॥

ভদ্রা আবার প্রণাম করিল। অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভদ্রা?"

ভদ্রার যেন চমক ভাঙ্গিল। কিন্তু আবার কি হইয়া গেল আবার তাই হইল। ভদ্রা বলিল—ঐ দেখ আমার স্বামী কে? আমি যাহা চাই তুমিই তাই। তুমি তোমায় দেখ? আশ্চর্য্য! অর্জ্জুন আপনার দিকে চাহিলেন—ধীরে ধীরে অর্জ্জুনাভিমান স্বরূপে লয় হইল। নিমেষের মধ্যে অর্জ্জুন দেখিলেন তিনিই সেই। স্থিতি হইল গোশৃঙ্গে সর্ষপবৎ—তাহাতেই সব হইল—অর্জ্জুন আশ্চর্য্য মানিলেন—ভদ্রাকে প্রণাম করিতে চাহেন দেখিলেন ভদ্রা গৃহে নাই। পরক্ষণেই ভদ্রা হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিল—

"আর তোমার সেই গল্পটা?"

অর্জ্জুন—কি ভদ্রা?

ভদ্রা—সেই যে।

অর্জ্জুন—কি ভদ্রা?

ভদ্রা—সেই যে আমার মন চুরি করিবার জন্য যাহা বলিয়াছিলে?

অর্জ্জুন—যাও! যাও! আমি কখন কাহারও মন চুরি করিবার জন্য কিছু করি নাই।

ভদ্রা—নাই কর—যা কিছু করিবার আমিই করিয়াছি কিন্তু বল না—সেই যে—এক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ—

অর্জ্জুন—তুমি বুঝিতে পার নাই ভদ্রা—আমি তোমাকে তোমার ও আমার স্বরূপের কথা বলিয়াছিলাম। আপনারা যথার্থ কে ইহা জানা না থাকিলে মায়ার ঘোর অতিক্রম করা যায় না। তখন আবার একবার ভাল করিয়া বুঝাইলেন। ভদ্রা বড় তন্ময়ী হইয়া শুনিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ শুনিয়া শুনিয়া ভদ্রা ধারণা করিয়াছিল তাহারা কে।

আপন স্বরূপের সংবাদ না পাইলে কি প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হওয়া যায় ?

ভদ্রা অনেক সময়ে পতির উপদেশ, পতির লীলা—ভগবৎ লীলা মনে মনে আবৃত্তি করিত। অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়া ভাবিত যিনি যুগে যুগে নানা অবতার গ্রহণ করিয়া লীলা করেন তিনিই পতিরূপে লীলা করিতেছেন। ভদ্রার গুরু ও গোবিন্দ এক হইয়া গিয়াছে। ভদ্রা দেখিত কৈ এমন সুন্দর ত আর নাই। এমন প্রেমময়, এমন নয়নাভিরাম, এমন মনোভিরাম, এমন বচোভিরাম, এমন শ্রবণাভিরাম—কি আর বলিব আরত বলা যায় না—এমন সদাভিরাম এমন সততাভিরাম—এমন আর ত হইতে পারে না—এমন সর্ব্বেন্দ্রিয়রসায়ণ ত আর হয় না। ভদ্রা আপন সৌভাগ্য দেখিয়া আপনি উন্মত হইত। ভদ্রা যেখানে যাইত সেই খানেই যেন পতি-নারায়ণ ব্রত আপনি প্রচারিত হইত। কথায় কথায় পতিই যে নারায়ণ এই কথা উঠিত। কেহ কোন সন্দেহ তুলিলে ভদ্রা বড় আদর করিয়া বুঝাইয়া দিত কিরূপে স্বামী ও স্ত্রীর ইচ্ছা প্রথমে একটিমাত্র সৎ লক্ষ্যপানে চলিবে। সৎপথে ইচ্ছার মিলন হইলেই পতি নারায়ণ আর স্ত্রী সহধর্ম্মিনী। ধর্ম্মের জন্য স্ত্রী অন্য কিছুর জন্য নহে। ভদ্রার কথায় যেন কি এক সজীবতা থাকিত। একবারে জীবন্ত-বাক্য হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া যেন জোর করিয়া ভদ্রার কথামত কার্য্য করাইত।

ভদ্রা আজ কিন্তু আপনার কথা আপনি ভুলিয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন যাইবেন ভদ্রা যেন কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছে না। অর্জ্জুন যাইবেন শুনিয়া অবধি ভদ্রার কিছুতেই শান্তি নাই। ভদ্রা কতক্ষণ ইতস্ততঃ পাদচারণ করিল পরে আবার আসিয়া

পূর্ব্বস্থানে বসিল। ভদ্রা কত কি ভাবিতেছে এমন সময়ে অর্জ্জুন আসিলেন। অর্জ্জুনের হস্তে কি জানি কি ছিল—ভদ্রার বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া অর্জ্জুন তাহা গোপন করিলেন। অর্জ্জুন ভাবিতেছেন ভদ্রার বিষাদ প্রথমেই দূর করিতে হইবে। সহধর্ম্মিনী হইলে পতির ইহাতে কোনও ক্লেশ নাই। আর ভদ্রা—শুধু সহধর্ম্মিনী নহে—প্রেমময়ী, রঙ্গময়ী, সর্ব্বশক্তিময়ী—ইহার বিষাদভাব দূর করা কৃষ্ণসখার পক্ষে কতক্ষণের কার্য্য? অর্জ্জুন বসিলেন, ভদ্রা নিকটে আসিয়া বসিল। ভদ্রা কতক্ষণ পরে বলিল, তুমি যাইবে আমি কি করিয়া থাকিব?

অর্জ্জুন—কেন ভদ্রা, আমি কি তোমায় রাখিয়া যাইব?

ভদ্রা—আমায় সঙ্গে লইয়া যাইবে?

অর্জ্জুন—তাও কি আবার বলিতে হইবে?

অর্জ্জুন বলিলেন এক, ভদ্রা বুঝিল আর। এক বলায় আর বুঝিলে কোথাও গোল ঘটে, কোথাও গোল মেটে। এক্ষেত্রে কিন্তু গোল মিটিয়া গেল। ভদ্রা যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

অর্জ্জুন বলিলেন দ্বাদশ বৎসরের পর তিনি যখন ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবেন তখন ভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। এখন কিন্তু দশম বৎসর। একাদশ বৎসর অর্জ্জুন পুষ্করে বাস করিবেন। দ্বাদশ বৎসরে বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, লহরীকুণ্ড, প্রভাস, জ্বালামুখী, ইত্যাদি পরিভ্রমণ করিয়া দ্বারকায় আসিবেন—আসিয়া ভদ্রা সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিবেন। ভদ্রা বুঝিল—ভদ্রা বরাবর অর্জ্জুনের সঙ্গে থাকিবে। গোল মিটিয়া গেল—ভদ্রার চক্ষু যেন হাসিয়া উঠিল, মুখ প্রফুল্ল হইল, আর অর্জ্জুন বলিলেন "দেখ কি আনিয়াছি?"

ভদ্রা দেখিতে না দেখিতে অর্জ্জুন ভদ্রার গলদেশে কি

পরাইয়া দিলেন। ভদ্রা প্রণাম করিয়া তাহা উন্মোচন করিল, এবং অর্জ্জুনের গলে দিল—অর্জ্জুন পুনরায় উহা ভদ্রার হস্তে দিলেন। ভদ্রা দেখিল বনফুলের মালা।

অর্জ্জুনের বোধ হইল ভদ্রা বহুক্ষণ ধরিয়া মালা দেখিতেছে। অন্য পুষ্পের পত্রে ও পুষ্পে প্রভেদ আছে, বনফুল পত্রেরই মত। নবদূর্ব্বাদল শ্যামবর্ণ। ভদ্রা কি দেখিতেছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কি দেখিতেছ?"

ভদ্রা—কেমন গাঁথা হইয়াছে দেখিতেছি।

অর্জ্জুন—কেমন গাঁথা হইয়াছে?

হাসিতে হাসিতে ভদ্রা বলিল—চক্ষু কিন্তু মালাতেই পড়িয়া রহিল—বলিল—"যেন কোন রূপে কথারক্ষা হইয়াছে—যেন দায়গ্রস্ত হইয়া গাঁথা হইয়াছে।"

অর্জ্জুন—তাই হইল—যেন দায়গ্রস্ত হইয়াই গাঁথা হইল কিন্তু তোমার আর কে করিবে?

ভদ্রা বড় বড় চক্ষু তুলিয়া অর্জ্জুনের দিকে চাহিল। এক কথায় স্নেহ, অভিমান, গর্ব্ব, মান চারিভাব মাখা। ভদ্রা দেখিল একখানা আদরভরা সুন্দর মূর্ত্তি জ্বলন্ত ভাবে ঝলমল করিতেছে। যেন ইহা রক্তমাংসের নহে, যেন ইহা ভাবের। ভদ্রার প্রাণে শত সাধ জাগিয়া উঠিল। ভদ্রা প্রাণের ভাব কার্য্যে প্রকাশ করিতে চাহিল কিন্তু চঞ্চলে গাম্ভীর্য্যমাখা সেই মূর্ত্তি দেখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় জড়প্রায় বাঁধা পড়িয়া রহিল। অর্জ্জুন ভদ্রার মনের অভিলাষ বুঝিলেন—বলিলেন "সত্যভামা হইলে কি করিতে?"

ভদ্রা উত্তর করিতে পারিল না। কিন্তু প্রাণের ভাব চক্ষুতে ফুটিয়া উঠিল। অর্জ্জুন বলিলেন 'গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, বক্ষে মস্তক রাখিয়া, কেমন হইয়া যাইতে'—কেমন?

ভদ্রা লজ্জা পাইল। ভাবের কার্য্য তড়িতের মত হইয়া যায়—বিশ্লেষণ চলে না। অর্জ্জুনের কিন্তু বিশ্লেষণই উদ্দেশ্য। আর সংযমী না হইলে ভাবের উদয়কালে বিশ্লেষণ কেহ করিতে পারে না। অসংযমী ভাবের হস্তে খেলার পুতুল। আর ভাব, সংযমীর হস্তে ক্রীড়ার সামগ্রী। ভাবে আপনাহারা হওয়া কাঁচা অবস্থা, ভাবকে আয়ত্বাধীন করা পাকা অবস্থা। সব জানিয়া, সব শুনিয়া, কলের পুতুল হওয়া—একবারে বোকার মতন হওয়া শেষ অবস্থা। পরাভক্তি বা অভেদ ভক্তির দৃষ্টান্তে ইহা পাওয়া যায়। ভগবান্ বশিষ্ঠের পাদোদক মস্তকে ও হৃদয়ে মাখিয়া রাম সীতার হর্ষ এই পরাভক্তির দৃষ্টান্ত। নারদের নিকটে—'আমার মত সংসারীর আপনার দর্শন লাভ' ইত্যাদি রামচন্দ্রের উক্তি ঐ প্রকারের, আর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার লীলাও ঐ প্রকারের।

যাহা হউক অর্জ্জুন ভদ্রাকে আবার বুঝাইলেন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীকে সংযম শিক্ষা কেহই দিতে পারে না। বিবাহ হইলেই বিবাহ হয় না। আমার হৃদয় তোমার হইল, তোমার হৃদয় আমার হইল, শতবার বলিলেও যার যার হৃদয় তার তার কলিজার মধ্যেই ধড়ফড় করে দেখা যায়। হৃদয় দান করা মুখে বলিলেই হয় না। সর্ব্ব অভিলাষ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপদে আশা, ইহাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা রিপু ও ইন্দ্রিয় শান্ত করা। তাহার পর তৃতীয় কথা—পঞ্চপ্রাণ কৃষ্ণপদে দান করা— এতদ্ভিন্ন অনুরাগে গোবিন্দ ভজন হয় না। এ ছাড়া পতি-নারায়ণ ব্রত উদ্‌যাপন হইবে না।

স্বামী ও স্ত্রীর প্রাণে শত সাধ জাগিবে কিন্তু বড় সাবধানে ব্যভিচারের হস্ত হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিতে হইবে।

সাধারণ স্ত্রীলোক ও 'আমি সহধর্ম্মিনী ধর্ম্মের জন্য আমায় আনা হইয়াছে' এই কথা যদি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে শিক্ষা পায় তবে স্বামীর দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে। তোমার কথা ভদ্রা স্বতন্ত্র। তোমার মধ্যে আপনা হইতেই সমস্তের স্ফুরণ হইতেছে। আমার বলা উচিত তাই বলি। যতদিন পর্য্যন্ত স্বামীর চিন্তায় স্ত্রীর সর্ব্বশরীর হর্ষপুলকে ভরিয়া না যায়, ততদিন কেহ কাহাকে স্পর্শও করিবে না। যত দিন ভিতরে পূজা ঠিক না হয়, ততদিন বাহিরের পূজা ঠিক হয় না। প্রথমে মানস-পূজা পরে বাহিরের পূজা। প্রথমে ভিতরে সেবা পরে বহিঃ সেবা। ভদ্রা ! এই জন্যই বিবাহকালে কুশণ্ডিকামন্ত্রে বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর নিকটে সংযম শিক্ষা করিয়া পরে সংসার করিতে হইবে—এই ব্যবস্থা।

আবার বলি অগ্রে মানস-পূজা না হইলে বাহিরের কোন পূজাই ঠিক হইল না। বিবাহযজ্ঞে অন্তর্যাগশূন্য বহিঃ পূজায় ব্যভিচার মাত্র সৃষ্ট হইল। ইহার ফলে সন্তান আর আনন্দগ্রন্থী নহে—বিষাদগ্রন্থীমাত্র। ইহার ফলে সংসারে অধম সন্তানের সৃষ্টি, পৃথিবীর পাপভার বৃদ্ধি—সংস্যার আশ্রমের চৌর্য্যাশ্রমে পরিণতি ; আর মানস-পূজায় পরিপক্কতা জন্মিলে দিন দিন অনুরাগের বৃদ্ধি—দিন দিন ভগবৎপ্রেমে প্রাণ মাতোয়ায়া হইতে থাকে। নির্ম্মল অনুরাগে যখন হৃদয় ভরিয়া যায় তখন স্বামী দেখেন হস্ত গলদেশে সংলগ্ন কিন্তু চলন নাই, চক্ষু চক্ষুর উপর ন্যস্ত কিন্তু কামকটাক্ষ নাই, প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গস্পর্শে জড়প্রায় পড়িয়া থাকে—ক্রমে ভাব আয়ত্ত হইয়া যায়, তখন স্বামী স্ত্রী সহজেই জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া কোন এক নিত্যধামে নিরন্তর বিহার করিবার উপযোগী হয়েন। এ অবস্থার কথা

ভাষায় বলা যায় না। কোন রূপে প্রকাশ করিতে হইলে কবির ভাষায় বলিতে হয়—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।

স্বামী বলেন, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, আমার নয়নের কৌমুদী তুমি--তুমিই আমার অঙ্গে অমৃত। সংযমী স্ত্রীপুরুষের স্পর্শ কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"

সংযমী স্বামী সংযমিনী স্ত্রীর স্পর্শে কি অনুভব করেন তাহা যেন কথায় প্রকাশ হয় না। স্বামী বলেন একি সুখ অথবা দুঃখ—আমি কি অনুভব করিতেছি? আমি কি জাগ্রত অথবা নিদ্রিত? একি—আমার শরীরে বিষসঞ্চরণ করিতেছে অথবা সম্মোহানন্দময় ভাব বিচরণ করিতেছে—ইহাত কিছুই নিশ্চয় হয় না। তোমার এক একবার স্পর্শে সমস্ত ইন্দ্রিয় মুগ্ধ হইতেছে, আমার চেতনা, আমার বুদ্ধি, কখন যেন মুদিত হইতেছে, কখন যেন প্রকাশিত হইতেছে।

অর্জ্জুন শেষে বলিলেন, ভদ্রা, ইহার নাম সংযম। ভদ্রা প্রাণ মন এক করিয়া মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল, আবার অর্জ্জুন বলিলেন "ভদ্রা, তোমাকে আমি নিজের মনের মত করিয়া গড়িব। দেখ সমান মনোবৃত্তির আস্বাদন সুখই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বোপরিস্থ আনন্দ"।

ভদ্রা কি উত্তর দিবে ? চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল; অতি কষ্টে ভদ্রা বলিল 'তুমি যেমন গড়িবে, আমি সেইরূপ গড়া হইব এই আমার সাধ। আমায় আর ছাড়িয়া যাইও না।' অর্জ্জুন বুঝিলেন এখনও বিলম্ব আছে। চপলতা এখনও ধৈর্য্য-মুখে আইসে নাই। শীঘ্রই আসিবে। অর্জ্জুন নানারূপে পরীক্ষা করিতেন অথচ ভদ্রা তাহা বুঝিতেন। গুরু যেমন শিষ্যকে শঙ্কটের অবস্থায় ফেলিয়া দেখিতে থাকেন কত দূর হইল অর্জ্জুনও সেইরূপ করিতেন। আজ ভদ্রার সে দিনের ব্যবহার মনে পড়িল। ভদ্রা সে দিন বড়ই ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিতে-ছিল। অর্জ্জুন বহুক্ষণ কৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। অর্জ্জুন নিঃশব্দে গৃহে আসিয়া দেখিলেন ভদ্রা যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভদ্রা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে নাই। অর্জ্জুন পশ্চাৎ হইতে ভদ্রাকে স্পর্শ করিলেন ভদ্রা চমকিয়া উঠিল।

অভিমানে ভদ্রা বলিয়া উঠিল 'যাও' 'যাও'।

কোথায় যাইব ?

যেখানে এতক্ষণ ছিলে।

সেই থানেই ত আছি। ভদ্রাময় জগৎ যাইবার পথ ত রাখ নাই। আমি কি চাই তাহা কি তুমি জান না ?

জানি সব কিন্তু এখন ওকথা থাক। স্নান আহারের সময় অতিবাহিত হইয়াছে।

ভদ্রা তখন স্বামী সেবার আয়োজনে ব্যস্ত হইল। ভদ্রা রাজার মেয়ে, শ্রীকৃষ্ণের বড় আদরের ভগ্নী দাস দাসীর অভাব নাই। তথাপি ভদ্রা স্বামীর সমস্ত কার্য্য আপনিই করিবে। ভদ্রা স্বহস্তে শয্যা প্রস্তুত করিত। স্বহস্তে রন্ধন করিত অন্যান্য গৃহ কার্য্য করিত। অর্জ্জুনের কোন কার্য্য দাসীদিগকে করিতে দিত না।

ভদ্রা সে দিন কি এক কার্য্যে যাইতে উদ্যত—অর্জ্জুন এক দাসীকে আজ্ঞা করিলেন। দাসী একবার স্বামিনীর দিকে চাহিল। দাসী শুনিল শুনিয়াও করিল না। অর্জ্জুন বিস্মিত হইলেন আর দেখিলেন ভদ্রা হাসিতেছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন— এ শিক্ষা কি তোমার?

ভদ্রা—হাঁ আমারই হুকুম।

অর্জ্জুন—এই কি ঠিক?

ভদ্রা—দাসী আমার—আমি যাহা বলিব তৎক্ষণাৎ করিবে পরীক্ষা করিতে চাও?

অর্জ্জুন—আর আমি বলিলে শুনিবে না? এই শিক্ষা তুমি দিয়াছ?

ভদ্রা অর্জ্জুনের স্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। ভদ্রা বড় কাতর হইয়া বলিল তোমার কার্য্যের জন্য আমি আছি। আমার দাসী অনেক কিন্তু তোমার দাসী একজন। তোমার দাসী আমি। এ অধিকার আমি কাহাকেও দিতে পারি না। কাহাকেও দিয়া আমি তৃপ্তি পাই না। আমি কি ঠিক বুঝিয়াছি?

অর্জ্জুনের আজ এ কথা মনে পড়িল। ভদ্রার ধৈর্য্য অভ্যাস জন্য অর্জ্জুন অনেক উপায় বলিয়াছেন। অর্জ্জুন দেখিলেন ভদ্রা শীঘ্রই পারিবে। এখন বিচারের সময়। এখনই প্রকৃত পরীক্ষা।

অর্জ্জুন সব বুঝিয়া বড় মধুর করিয়া ডাকিলেন "ভদ্রা"। ভদ্রা বিভোর হইয়া উত্তর করিল "বল"। অর্জ্জুন ইহা লক্ষ্য করিলেন। ভদ্রার ভাষা ভাবে গদগদ হইয়া গিয়াছে। অর্জ্জুনের বড়ই ভাল লাগিল। অর্জ্জুন ভাবিলেন কৃষ্ণ-ভগিনী—ইহাতে সমস্ত উপাদান পরিলক্ষিত হইতেছে। পাত্র ঠিক মিলিয়াছে—অর্জ্জুন তখন ভদ্রাকে একটু বাহিরে জাগ্রত করিবার জন্য বলিলেন ভদ্রা, "এত

যে ভালবাস"—ভদ্রা বাধা দিল, বলিল, দেখ আমি কিছুই ভাল বাসিতে পারিলাম না।

অর্জ্জুন—না পার কিন্তু যদি আমার সংবাদ না পাও তবে-কি কর?

ভদ্রা বড় শীঘ্র এ কথার উত্তর দিল। বলিল—কি আর করি—একটু জ্বলি, একটু পুড়ি, একটু অভিমান করি, আর করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া একটু ছাই রাই ভাবি—আর কি করি?

অর্জ্জুন—তার পর কি কর?

ভদ্রা এবারে যেন আর এক রকম হইয়া বলিল "যদি তুমি সত্যই চলিয়া যাও?"

অর্জ্জুন—হাঁ, যদি আমি এখন যাই তুমি কি কর?

ভদ্রা এবার হাসিল—হাসিয়া বলিল সে সাধ্য তোমার নাই। তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইতে পার না—আমার যে আর কেহই নাই। তুমিই যে আমার সবার স্থান অধিকার করিয়াছ, তুমিই যে আমার একমাত্র আশ্রয়, তুমি কি আমায় ক্লেশ দিতে পার?

অর্জ্জুন—কেন সে দিন ত তোমায় তিরস্কার করিয়াছিলাম। তবে কেন বলিতেছ আমি তোমায় ক্লেশ দিতে পারি না?

ভদ্রা—দেখ তুমি আমার কে তা তুমি বুঝি জানিয়াও জান না। তুমিই আমার গুরু, তুমিই আমার গোবিন্দ, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তুমিই আমার সকল সাধের সমষ্টি। আমি কি ছিলাম, তুমি আমায় কি করিয়াছ, তাহা কি তুমি জাননা? তুমি আমার দোষ দেখাইয়া না দিলে কে আমায় দেখাইবে? আর তোমার তিরস্কার? কি করিয়া তোমায় আমি বলিব, তোমার তিরস্কার ও পুরস্কার আমায় কি করে? তোমার আদরে, তোমার তিরস্কারে,

আমি একই সৌন্দর্য্য অনুভব করি। কি করিয়া তোমায় জানাইব, তোমার আদরে আমি যে আনন্দ উপভোগ করি, তোমার তিরস্কারে আমার তদপেক্ষা কত অধিক আনন্দ হয়? তুমি যে আমায় তোমার করিয়া লইবার জন্য আদর কর, তুমি যে আমার তিল পরিমাণ ব্যভিচার দেখিলে বিশেষ ক্লেশ পাও, আমায় তিরস্কার করিয়া তুমি যে জানাইয়া দাও তুমি তোমাকেই তিরস্কার করিতেছ—আমি ইহা বুঝিয়া যে কি হইয়া যাই তোমায় কি করিয়া জানাইব বল?

অর্জ্জুন ভদ্রার ভালবাসার গভীরতা দেখিয়া বড় প্রীত হইয়াছেন। প্রীত হইয়া অর্জ্জুন ভদ্রাকে যেমন পুরস্কার করিতে যাইবেন এমন সময়ে সত্যভামা কৃষ্ণ সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এক মুহূর্ত্তে কিন্তু ভাবের একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। অর্জ্জুন ঝটিতে বড় একাগ্র হইয়া কৃষ্ণ ও সত্যভামাকে প্রণাম করিলেন। আর ভদ্রা কাহাকেও প্রণাম না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কৃষ্ণ হাসিলেন—অর্জ্জুনের প্রণাম সাঙ্গ হইলে ভদ্রা অগ্রে অর্জ্জুনকে প্রণাম করিয়া শেষে সত্যভামা ও শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ করিল। কৃষ্ণ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভদ্রা, ঠিক ত হইয়াছে?

ভদ্রা কৃতজ্ঞতায় জড়সড় হইয়া গেল। সত্যভামা একটু নিকটে সরিয়া আসিলেন আসিয়া ধীরে জিজ্ঞসা করিলেন "জগৎ-পতি অপেক্ষা কি পতি বড়?"

ভদ্রা একটু হাসিয়া আর একটু সত্যভামার নিকটে সরিয়া আসিয়া শুধু সত্যভামা শুনিতে পায় এরূপ স্বরে উত্তর করিল—গুরু ও গোবিন্দ এক। কিন্তু গোবিন্দ কৃপা না করিলে গুরু মিলেনা। আবার গুরু দেখাইয়া না দিলেও গোবিন্দ দর্শন হয় না। গোবিন্দ ও গুরু যে এক, গুরু বুঝাইয়া না দিলে ইহা বুঝা যায় না। সত্যভামা বড় সন্তুষ্ট হইলেন, একটু

যেন ভাণ করিয়া বলিলেন 'আর আমার পরিশ্রমের পুরস্কার বুঝি কিছুই নাই'?

ভদ্রা সত্যভামার চরণে মস্তক রাখিয়া আবার প্রণাম করিল। সত্যভামা ভদ্রাকে তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন, আর বলিলেন—

"ভদ্রা, তোর দৃষ্টান্তে নারীজাতি পতিতেই নারায়ণ দেখুক, পতিসেবাতেই নারায়ণসেবা অনুভব করুক, ব্রত উপবাস তুচ্ছ করিয়া পতির সন্তোষই শ্রেষ্ঠ ব্রত ইহা ধারণা করুক, এই আমার আশীর্ব্বাদ।"

লেখকের প্রতিধ্বনি "তথাস্তু"। বঙ্গনারীর হৃদয়ে ভদ্রা-আদর্শ জীবন্ত রহুক।

পরিশিষ্ট।

প্রথম কথা।

বিরহ—ধৈর্য্য—মানস পূজা।

এই মাত্র সে ত গিয়াছে আমার একি হইল? সে ধৈর্য্য কোথায় গেল? সে যে কত যত্নে উপদেশ ধরাইল। হরি হরি এখনি যে সব ভাসিয়া যায়। আমি এত অস্থির হইলাম কেন? ভদ্রা কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছে না। কৈ পূর্ব্বেও ত অর্জ্জুন ইচ্ছা করিয়া দীর্ঘ সময় দর্শন দিতেন না কিন্তু তখন ত ভদ্রা বড় সুন্দর অবস্থা ভোগ করিত। সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেঘের ছায়া যখন পুষ্পিত বৃক্ষে বৃক্ষে খেলা করিত, ভদ্রা তখন তাহাতে তাহাকেই দেখিত। বৃক্ষশাখা সমূহের অন্তরালে যে অবকাশ, ভদ্রা তাহার মধ্যে এক জনের সস্মিত মুখ দেখিয়া কত আনন্দ পাইত। আকাশে চাঁদ উঠিলে ভদ্রা চন্দ্রমধ্যে তাহাকেই দেখিত। প্রতি নক্ষত্রে যেন্র সে দাঁড়াইয়া ভদ্রাকে ইঙ্গিত করিত। প্রতি পক্ষীর শব্দে ভদ্রা শুনিত সে যেন কথা কহিয়া গেল। প্রতি পুষ্পে ভদ্রা তাহার হাসি দেখিত। নদীর কুল কুল ধ্বনিতে ভদ্রা তাহারই কণ্ঠস্বর শুনিত। নীল আকাশ দেখিয়া দেখিয়া ভদ্রা সব ভুলিয়া যাইত। মনে হইত আকাশ যেন জ্যোতিতে ভরিয়া গিয়াছে—সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, অধে, পার্শ্বে, দূরে সর্ব্বত্র যেন তেজঃপূর্ণ আকাশ। ভদ্রা দেখিত ঐ অনন্ত জ্যোতিঃপূর্ণ আকাশ তাহারই মধ্যে। ভদ্রা ভাবিত আমি কত বড়—আমার মধ্যে যখন এত বড় একটা বস্তু রহিয়াছে। ভদ্রা আপন ক্ষুদ্র দেহকে তখন বাহিরে রহিয়াছে বোধ করিতে পারিত না। যেন সবই ভিতরে। দর্পণ মধ্যে

দৃশ্যমান নগরীর ন্যায় আপন স্বচ্ছ পরিপূর্ণ অন্তরাকাশে যেন জগৎ ভাসিতেছে বোধ হইত। ভদ্রা আপনা ভুলিয়া কখন সেই জ্যোতিঃ সমুদ্র একটি নীল বিন্দু দেখিত। নীল বিন্দুর দিকে চাহিতে চাহিতে ভদ্রা দেখিত নীলকান্ত-মণি-গঠিত সুন্দর মূর্ত্তি। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পার্শ্বে তড়িৎময়ী নারী মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিত। বলিত এই আমি ওই সে। সর্ব্বত্র ভদ্রা দেখিত, সে ও আমি। সর্ব্বত্র তাহার সত্বা উপলব্ধি করিয়া ভদ্রা কতবার বলিত তুমি আমার অন্তরে সর্ব্বদা আছ। চক্ষু মুদ্রিত করিলে দেখি তুমি, চাহিলেও দেখি তুমি। তুমি এক, তুমি বহু। তাই তোমার পূজায় আমার সাধ। তুমি আমার কে আমি বুঝিয়াও বুঝিনা। কৈ আর কাহারও আদরে ত আমার হৃদয়মুকুল ফুটিয়া উঠেনা, আর কাহারও স্বর ত দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনি ছুঠায় না, আর কাহারও স্পর্শে ত হৃদয়ে তড়িতপ্রবাহ বহেনা, আর কাহারও সোহাগে ত অন্তস্তল ভেদ করিয়া উর্দ্ধে আনন্দ প্রবাহ বহে না, কৈ আর কাহারও দৃষ্টিতে ত হৃদয়তন্ত্রী তালে তালে নাচিয়া উঠে না। কৈ আর কাহারও মধুময় সম্বোধন ত নির্জ্জনে বসিয়া অভ্যাস করিতে পারি না। আর কেহ ত আমায় স্থির আনন্দ প্রদান করিতে পারে না।

আমি যে জানিতে পারি কখন তুমি আসিবে। যে দিন চন্দ্রমা পূর্ণ হইয়া আকাশে উদিত হয়, সমুদ্র বক্ষ উন্নত করিয়া অপনা হইতেই তাহাকে ধরিতে যায়। আমার হৃদয় উদ্বেল হইলেই বুঝিতে পারি তোমায় পাইব। তোমায় দেখিলে হৃদয় কত সুরে বাজিয়া উঠে জান কি? কোকিল বসন্তে গান করে, বসন্তকাল তাহার কারণ নহে, আম্রমুকুল বা মলয় পবন তাহারা কারণ নহে। তাহার প্রিয় নিকটে বলিয়া গান আইসে। তোমায়

দেখা অবধি আমার ভয় গিয়াছে। আমি লোক দেখিয়াও লোক দেখিনা। লোকে আমার কতই সুখ্যাতি করে—আমি বড় সুন্দরী, আমার কথা বড় মিষ্ট—এ সব সুখ্যাতি আমার নহে, সব সুখ্যাতি তোমার। তোমার রূপে আমি রূপবতী, তোমার কথায় আমার কথা মিষ্ট। আমিত কিছুই জানিনা, তুমি আমার মধ্যে বড় মধুর করিয়া কথা কও, লোকে ভাবে আমি কথা কহিতেছি, আমি জানি কথা তোমার, আমার নহে। আমার শ্বাস আমার নিকটে সুগন্ধি বলিয়া মনে হয় এ শ্বাসও যেন তোমার। তোমায় ছুঁইয়া থাকি তাই ইহা সুগন্ধবিশিষ্ট। কি তুমি, কি আছে তোমাতে, কি করিয়া আমি বলিব ? আমার মন, আমার বাক্য, আমার দেহ, তোমায় পাইয়া নূতন হইয়া গঠিত হইয়াছে—সকলই তোমার।

এই অবস্থা ভদ্রার হইয়াছিল। সে ত বেশী দিনের কথা নয়! কিন্তু আজ ? আজ ত ভদ্রা স্থির হইতে পারিতেছে না। ভদ্রা বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। যেখানে অর্জ্জুন দাঁড়াইয়া ছিলেন, যেখানে দাঁড়াইয়া অর্জ্জুন বিদায় লইয়া গিয়াছেন, ভদ্রা সেই স্থানে আসিয়া শয়ন করিল। ভদ্রার মনে হইল স্থানটি যেন এখনও উত্তপ্ত। ভদ্রা ঐ স্থানে বক্ষ চাপিয়া কতক্ষণ পড়িয়া রহিল। ভদ্রার চক্ষে জল আসিল। ভদ্রা উঠিয়া বসিল, ভাবিল আমি একি করিতেছি ? স্বামীর উপদেশ মত স্ত্রী স্থির হইতে চেষ্টা করিল, স্থির হইতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিল—কিছুইত ভাল লাগেনা। কিছুতেই ত চিত্ত শান্ত হয় না। ভদ্রার সম্মুখে ফাল্গুণীর গুণরাশি উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইল। ভদ্রা ভাবিল—হায় এত গুণ তোমার—আমার পরাণ পুতুলী কি তোমার হইয়াছে ? তোমার পরাণ পুতুলী কি আমার হৃদয়ে ? এই শ্বাস! ইহাত

আমার জীবন নয়—ইতর জীবের জীবন শ্বাস। আমার জীবন ত আনন্দ! আনন্দ আমার পরাণ পুতুলী। সেত গোবিন্দ—আনন্দ পুতুলী ত সেই। আমার আনন্দপুতুলী তোমায় দিয়াছি, তোমার পরাণ পুতুলী আমার হৃদয়ে। ভদ্রা একটু শান্তি অনুভব করিল—আর তার গুণ রাশি আরও প্রবল ভাবে হৃদয় ছাইয়া ফেলিল।

ভদ্রা ভাবিতেছে কতই তার গুণ। ভদ্রা একদিন কত অপরাধ করিয়াছিল—কৃষ্ণভগিনী! ভদ্রার প্রথম প্রথম কিছু অহঙ্কার ছিল। একদিন পূর্ব্ব সংস্কারবশে ভদ্রা স্বামীকে বলিয়াছিল "সংশোধন কর"—ভদ্রা কত অন্যায় করিয়াছিল। আর অর্জ্জুন? অর্জ্জুন ক্ষমা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন "তাহাই হইবে"। ভদ্রা অর্জ্জুনের ক্ষমা স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইল। কতই কাঁদিল—মনে হইল এখনই একবার তাহার নিকটে দৌড়িয়া যাই। তার চরণে মস্তক লুণ্ঠন করিতে করিতে বলি—"বল আমায় ক্ষমা করিলে"? সহসা অর্জ্জুনের উপদেশ মনে পড়িল। নারায়ণের ক্ষমা স্মরণ করিয়া মানুষ অপরাধী জীবকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা করুক। জীব কতই অন্যায় করে। নারায়ণ সকলের হৃদয়ে আছেন। তিনি সর্ব্বেশ্বর, জীব তাঁহাকে গ্রাহ্য করে না। প্রাণেশ্বরের দিকে না চাহিয়া, তাঁহাকে হৃদয়ে লইয়া পাপ করে—তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া কুলটাবৃত্তি করে—ভাবে, গোপনে বেশ্যাবৃত্তি করিলাম। তিনি সব জানেন, তিনি সব দেখেন, তথাপি ব্যভিচারী জীবকে ক্ষমা করেন। তথাপি কামুকের উপর দয়া রাখেন। কত দয়া তাঁর, কত ক্ষমা তাঁর! ভদ্রা এই উপদেশ স্মরণ করিয়া প্রাণে প্রাণে বুঝিল, স্বামী ক্ষমা করিয়াছেন। প্রাণ আশ্বস্ত হইল, একটা আনন্দপ্রবাহ অনুভব করিল।

গুণ স্মরণে আনন্দ আসিল। আনন্দ ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি

ধরিল। ভদ্রা শিহরিয়া উঠিল। মনে হইল সে হৃদয়ে দাঁড়াইয়া। কি সুন্দর নবজলধর শ্যাম মূর্ত্তি, কি মধুর হাস্য, কি অপার করুণা-মাখা দৃষ্টি! ভদ্রার মুদ্রিত চক্ষু উন্মীলিত হইল। মনে হইল নীলকান্ত মণির দ্যুতিতে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। সূর্য্যের পানে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিলে যেমন সূর্য্যমধ্যে এক উজ্জ্বল নীলবর্ণ দেখা যায়, ভদ্রা চারিধারে সেইরূপ নীলবর্ণ দেখিল। দেখিতে দেখিতে বর্ণ ঘন হইল। মূর্ত্তি ধরিল। সে মূর্ত্তি অর্জ্জুনের। তখন গৃহের যে বস্তু দেখে, তাহাই যেন জ্যোতিজড়িত অর্জ্জুন। যেন সকলের সঙ্গে সে মিশিয়া রহিয়াছে, সে যেন যায় নাই। ভদ্রা আজ যাহা দেখিতেছে, তাঁহাকেই প্রণাম করিতেছে। বড় সাধ হইল একবার নারায়ণ মন্দিরে যাইতে, ভদ্রা গৃহ হইতে বাহির হইল। নারায়ণ মন্দিরে আসিল। ভদ্রা ভক্তিভরে নারায়ণকে প্রণাম করিল। বহুবার মূর্ত্তি দেখিল। ভদ্রা বহুবার চক্ষু মার্জ্জনা করিল তবুও সেই। ভদ্রা অন্য কিছুই দেখিল না, দেখিল সেই। ভদ্রা বড় প্রীতি পাইল। তখন ভদ্রা সত্যভামার নিকটে আসিল। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে, ভদ্রা উভয়কে প্রণাম করিল। প্রণাম কালে মস্তক অবনত করিবামাত্র আবার সেই অন্তর্জ্যোতিঃ, আবার সেই মূর্ত্তি চক্ষুর উপর ভাসিয়া চলিল তখন ভদ্রা বুঝিল, স্বামীর প্রাণ পুত্তলিকা চক্ষের মণিতে, বুঝিল—যাহা দেখে তাই সে।

ভদ্রার কখন মনে হইল রৈবতকে সেই শৈলশৃঙ্গে যাই। ভদ্রা এ ইচ্ছা বোধ করিল। "পতি বিরহে ভ্রমণ, এই ভ্রমণে সতীত্বের হানি হয়।" অর্জ্জুনের এই উপদেশ স্মরণ হইল। ভদ্রা যাইতে পারিল না। ভদ্রা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিল অন্যের গৃহে বাস ও বহুজনের সম্মুখে বাহির হওয়া সতীর পক্ষে দূষণীয়। সতী বহু-জনের দৃষ্টি সহ্য করিতে পারেন না। অন্যের চিন্তার বিষয় হইলে

সতীর স্বামি-চিন্তার বিঘ্ন ঘটে, অর্জ্জুন ভদ্রাকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

এই ভাবে ভদ্রার দিন কাটিতে লাগিল। কোথাও স্থির হইয়া বসিলে অগ্রে গুণ স্মরণ হইত, পরে মূর্ত্তি জাগিত। ক্রমে ইহাই অভ্যস্ত হইতে লাগিল। প্রকৃতির যে কোন সৌন্দর্য্য দেখিত, তাহাতেই স্বামি-মূর্ত্তি জাগ্রত হইত। ভদ্রা কতবার তাহার সহিত কথা কহিত। শূন্য স্থানে শূন্য মূর্ত্তি কিন্তু ভদ্রার হৃদয় ভরা। তীব্র ভাবনায় ভদ্রা তাহাকেই দেখিত। ভদ্রা জাগ্রত-স্বপ্নে যাহা দেখিত তাহা এত স্পষ্ট মনে হইত, বুঝি লোকে জাগ্রত কালেও দৃষ্ট বস্তুকে এত স্পষ্ট দেখে না। ভদ্রা কখন কখন সব ভুলিয়া বালিকার মত কত কথা কহিত, একাকিনী কথা কহিত বলিত, আমি রোজ আকাশ দেখি তুমি দেখনা? কত বৃক্ষ, কত পাখী, কত ছাই রাই। যতদূর দৃষ্টি চলে—ততদূর আকাশ; তুমি আমি এক আকাশের তলে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, তুমি পার? এই সীমাশূন্য আকাশ, উহার উপরে সুখতারা? সুখতারা দেখিয়াছ? বলত কত সুন্দর। এই বিশাল আকাশ আর এই ক্ষুদ্র তারা। আকাশ তারাকে কত আদরে বুকে ধরিয়াছে। কথা কহিতে কহিতে ভদ্রা কখন কখন শিহরিয়া উঠিত। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিত, আবার কত কি ভাবিত। কখন সত্যভামার কথা মনে হইত। সত্যভামা বলিতেন—ভদ্রা কত সুখী। ভদ্রা আপন গৃহে আসিয়া ভিতরে কথা কহিত। সম্মুখে একখানি আসন যত্ন করিয়া বিছাইয়া রাখিত। সেই আসনের পানে চাহিতে চাহিতে সব ভুলিয়া যাইত। মনে হইত—সে আসিয়াছে। ভদ্রা বলিত, দেখ লোকে বলে আমি সুখী। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখি—আমি সুখী কি দুঃখী? তুমি যেন সর্ব্বদা আমার দিকে চাহিয়া থাক!

লোকের সাক্ষাতে আমার লজ্জা করে। নির্জ্জনে বেশ লাগে; কিন্তু বলনা তুমি কথা কওনা কেন? ভদ্রা বিভোর হইয়া কখন শূন্য স্পর্শ করিতে যাইত। পরক্ষণেই বুঝিত এ সমস্তই কল্পনা। তবুও কল্পনাই অভ্যাস করিত। পরে কল্পনাই যেন সত্য হইয়া উঠিল। বাহিরের লোক জন, বৃক্ষ লতা, যেন ছায়া ছায়া মত বোধ হইতে লাগিল। তথাপি ভদ্রা ব্যবহারিক কার্য্য বড় নিপুণতার সহিত করিত। ভিতরে সর্ব্বদা প্রাণেশ্বরের সঙ্গে থাকিয়া, ভদ্রা হাসিতে হাসিতে সকল কার্য্যই করিতে পারিত। কোন কোন দিন ভদ্রা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া যাইত, যেন ভদ্রার সব হারাইয়া গিয়াছে। ভদ্রা কত চেষ্টা করিত, কিছুতেই সে আসিত না। কত কাঁদিত, আবার সে আসিত। ভদ্রা সর্ব্বদা নাম করিত। আর হৃদয় মধ্যে নাম লিখিয়া তাহাকেই জীবন্ত বলিয়া ভাবিত। নামের সঙ্গে কথা কহিত। ভদ্রার কাছে নাম নামী এক হইয়া গিয়াছিল। লোকে দেখিত, ভদ্রা দিন দিন মধুর হইতেও মধুর হইতেছে।

এই ভাবে নিত্য মানসপূজা অভ্যাসে ভদ্রা অপূর্ব্ব চিত্ত-চমৎকৃতি লাভ করিতে লাগিল। অল্পে অল্পে চপলতার স্থান, ধৈর্য্য আসিয়া অধিকার করিল। যে দিন অস্থিরতা আসিত, সে দিন ভদ্রা বড় সুখ পাইত। আপনার অসচ্ছন্দতা গ্রাহ্য করিত না, ভাবিত সে আমায় স্মরণ করিতেছে। অধিক আনন্দ দিবার জন্যই সে চঞ্চল করে। চলন আসিলেই ভদ্রা আপন গৃহে আসিত, আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থির ভাবে আপন আসনে বসিত।

একদিন ভদ্রা সায়াহ্নে মাতা ও কৃষ্ণমহিষীগণের সহিত নারায়ণের দোলপূর্ণিমা সজ্জা করিতেছিলেন। কত হীরা, মতি চুণি, পান্না, জড়িত রত্ন অলঙ্কার, কত সুন্দর সুন্দর বস্ত্র, ভদ্রা রত্ন-

ভাণ্ডার হইতে আনিয়া দিতেছে আর সত্যভামা যেখানে যাহা সাজে, তাহাই নারায়ণকে পরাইয়া দিতেছেন। অন্যান্য কৃষ্ণ-মহিষীগণ মন্দিরের অপর সজ্জা করিতেছেন। ভদ্রার উপর লক্ষ্মীর সজ্জার ভার। ভদ্রার সাজান শেষ হইয়াছে। কেবল রত্নমুকুট পরান হয় নাই। সত্যভামা ভদ্রাকে মুকুট আনিতে বলিয়াছেন। ভদ্রা মুকুট আনিতে গিয়া তিনটি মুকুট আনিল। লক্ষ্মীকে সাজাইয়া ভদ্রা ভাবিতেছে—এই দুইটি নূতন কিরীট কি জন্য? এমন সময় সত্যভামা নিকটে আসিলেন। সত্যভামা বলিলেন ইহা আনিয়াছ কেন? ইহার ব্যবহার অন্য সময়ের জন্য।

ভদ্রা হাসিল। সত্যভামা রত্নমন্দিরে মুকুট দুটি যত্ন করিয়া রাখিলেন। ভদ্রার চক্ষে কিরীট দুটি বড় ঝলমল করিল। ভদ্রা ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে আসিল।

সন্ধ্যা আসিয়াছে। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র বড় মধুর হইয়া উদিত হইয়াছেন। একটা চকোর চন্দ্রের কোলে কোলে উড়িয়া উড়িয়া যেন কি করিতেছে। ভদ্রা বাহিরে আসিয়া তাহাই দেখিতেছিল, আর ভিতরে একটা মধুর জ্বালা অনুভব করিতেছিল। তুলা রাশিকে মৃদু অগ্নি, যেমন ধীরে ধীরে পুড়াইয়া থাকে, ভদ্রার মনে হইল, যেন তাহার হৃদয়ে তুলার মত কি আছে, যেন আনন্দাগ্নির মত কি এক বস্তু, ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। ভদ্রা বহুবার ইহা লক্ষ্য করিয়াছে। ভদ্রা সঙ্কেত বুঝিল।

ক্রমে নারায়ণ মন্দিরের উৎসব শেষ হইল। ভদ্রা সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপনার গৃহে আসিল। সে রাত্রিতে ভদ্রার নিদ্রা আসিল না। আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে আসিয়া, ভদ্রা প্রিয় নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। নাম জপিতে জপিতে ভদ্রা বাহিরে ঘুমাইয়া পড়িল।

একি স্বপ্ন? না ইহাকে স্বপ্ন বলা যায় না। ভদ্রা আপন আসনে নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছে। ভদ্রা বাহিরে যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ভিতরে ভদ্রা পূর্ণ জাগ্রত। ভদ্রা দেখিতেছে, ভদ্রার স্থূল দেহ গলিত হইল। ভদ্রার নূতন দেহ হইল। সে দেহ যেন তন্মাত্র-গঠিত। সে দেহ ভাবনাময়। সে দেহ যেন আতিবাহিক। রূপ! তন্মাত্রের রূপ কত সুন্দর বর্ণনা করা যায় না। ভদ্রার অঙ্গগন্ধ! গন্ধ তন্মাত্র কত আনন্দ উদ্গারী, কিরূপে বলা যাইবে? ভদ্রার স্বর! ভদ্রার স্পর্শ! আর ভদ্রা রসতন্মাত্রে পূর্ণ সরসবতী, ভদ্রা তন্মাত্রের দেহে বড় সুন্দরী হইয়া বড় নূতন হইয়া যেন অর্জ্জুনের নিকট যাইতেছে।

অর্জ্জুনের দ্বাদশ বর্ষ প্রায় শেষ হইল। অর্জ্জুন বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া আবার পুষ্করে আসিয়াছেন। আর ভদ্রা? ভদ্রা দেখিতেছে ভদ্রাও পুষ্করে।

দ্বিতীয় কথা।

সূক্ষ্ম শরীরে লীলা।

ফাল্গুন মাস—দোল পূর্ণিমার রাত্রি। ভদ্রা দেখিতেছে, কার্ত্তিক মাস। দেওয়ালী হইতে তিন দিন অবশিষ্ট আছে। দেওয়ালীর দিন পুষ্কররাজ লোকে লোকাকীর্ণ হয়। "দিহাত" হইতে শত সহস্র নরনারী তীর্থরাজ দর্শনে আগমন করে। বালক বলিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কারে, সজ্জিত হইয়া আইসে। সকলের হস্তেই নূতন প্রদীপ। পুষ্করবাসী সকলেই কুটুম্বাদি সেবা জন্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে।

একটু বেলা উঠিলে, তীর্থবাসী সকলেই স্বজনসঙ্গে দলে দলে পুষ্কর তীর্থে স্নান করে। পুষ্কর একটী বৃহৎ জলাশয়। তিন দিক প্রস্তর দিয়া বাঁধা। বহু প্রাচীন তীর্থ এই পুষ্কর। এই দেশবাসী, দেওয়ালীর দিন, সমস্ত পুষ্কর তীর্থকে দীপাবলিতে সজ্জিত করে। স্নানের পরে, সকলে আপন আপন চিহ্নিত স্থানে প্রদীপ সাজাইতে আরম্ভ করে। রাত্রিকালে সকলেই প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়।

অমাবস্যার রাত্রি। তীর্থের উপরে বড় বড় প্রাচীন অশ্বত্থাদি বৃক্ষ। রজনী-আগমনে বৃক্ষাদির ছায়া, ঘন অন্ধকারের সহিত মিলিত হইয়া, যখন সমস্ত তীর্থকে ছাইয়া ফেলে, যখন জল, স্থল, সর্ব্বত্র, একমাত্র নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়, তখন সেই দীপমালার শোভা অতি অপূর্ব্ব হয়। পুষ্করের উচ্চতীর হইতে দীপালোক জলের মধ্যে নিপতিত হইলে মনে হয়, যেন পুষ্কর-তড়াগের ভিতর হইতে, কোন এক আলোকের অমরাবতী ভাসিয়া উঠিতেছে। সরোবরের জল আলোড়িত হইলে, সেই আলোক-রাজি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, জলাশয়কে গলিত সুবর্ণ-তরঙ্গান্বিত করে।

পুষ্করের নিকটেই সাবিত্রী পাহাড়। উহার সম্মুখেই কষ্টহরা পর্ব্বত নীচে ব্রহ্মাও গায়ত্রীর মন্দির। সর্ব্বত্র ঐ দিনে আলোক মালায় বিভূষিত হয়।

আজ ভদ্রার রূপ অপূর্ব্ব। দেহ পঞ্চতন্মাত্র গঠিত। নিতান্ত কোমল নিতান্ত সৌগন্ধবিশিষ্ট। মস্তকে সত্যভামা দত্ত কিরীট ঝলমল করিতেছে। পরিধানে অগ্নিবর্ণ উজ্জ্বল শাটী।

অর্জ্জুন অদ্য মাত্র পুষ্করে আসিয়াছেন। দেওয়ালী হইতে তিন দিন বাকী আছে। আজ প্রাতঃকালে অর্জ্জুন স্নান করিতে গিয়াছেন। স্নান করা শেষ হইল। নীল জলে নীলতনু জলসিক্ত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। অর্জ্জুন পূর্ব্বমুখে জলে দাঁড়াইয়া

সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেছেন। সন্ধ্যাদি শেষ হইয়াছে। সূর্য্য-প্রণাম কালে সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টি পড়িল, মনে হইল যেন সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতা জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি, অর্জ্জুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন—কিরীটকুণ্ডলধারিণী, শরদিন্দু-সুন্দরমুখী, গৌরাঙ্গী, যুবতী, কারুণ্যামৃত বর্ষণ করিতে করিতে, যেন দেওয়ালী ঘাটের উপর তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। অর্জ্জুন ভাল করিয়া দেখিলেন—পুলকে দেহ পূর্ণ হইয়া গেল। দেখিলেন ভদ্রা তীরে দাঁড়াইয়া। মুখে মৃদু হাস্য। কেশ পাশ আলুলায়িত। স্বর্গীয় মূর্ত্তি, স্বর্গীয় বসন ভূষণ—অর্জ্জুন দেখিতে-ছেন—ভদ্রা নীল নলিনাভ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া যেন অর্জ্জুনকে ডাকিতেছে। ভদ্রার এক হস্তে অর্জ্জুনের জন্য আভরণ, অন্য হস্তে নারায়ণ মন্দিরের দ্বিতীয় কিরীট। অর্জ্জুন তীরে উঠিলেন আর ভদ্রা অর্জ্জুনের সজ্জা করিয়া দিবার জন্য তীরস্থিত গৃহে প্রবেশ করিল।

ভদ্রা স্বহস্তে অর্জ্জুনের সজ্জা করিয়া দিল—মস্তকে মুকুট পরাইল। তখন ভদ্রা ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের স্কন্ধে আপনার দক্ষিণ বাহু স্থাপন করিল এবং অর্জ্জুনের বাহু আপন স্কন্ধে অর্পণ করিল। একাধারে শিব শক্তি জড়িত মূর্ত্তি—বড় শোভা ধারণ করিল। ভদ্রা বলিল "চল তোমার গৃহে যাই।"

অর্জ্জুন—"এই ভাবে" ?

ভদ্রা—"ক্ষতি কি।" ভদ্রা পারিল না। উভয়ে তখন গৃহে আসিলেন। আর ভদ্রা রন্ধনগৃহে চলিল।

"কোথায় যাও ?" অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভদ্রা—"ব্রহ্মচারীর কি ইহাতে আপত্তি হইবে ?"

অর্জ্জুন—"যদিই হয়।"

"আচ্ছা" বলিয়া ভদ্রা রন্ধনশালায় চলিল। ভদ্রা বহু কষ্ট করিল। কিন্তু একি! কিছুতেই অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। অগ্নি কিছুতেই জ্বলিবে না—ভদ্রাও বড় আগ্রহ করিয়া গিয়াছে। কিছুতেই ভদ্রা ছাড়িবে না। শেষে নীল-নলিনাভ চক্ষু কোকনদরূপ ধারণ করিল। অর্জ্জুন পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। ভদ্রার ক্লেশ দেখিলেন শেষে পশ্চাৎ হইতে চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন। ভদ্রা বড় শান্তি অনুভব করিল। অর্জ্জুন হাসিয়া বলিলেন "হইয়াছে ওঠ।" তখন অর্জ্জুন ক্ষণমাত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। ভদ্রা মুখে কিছুই বলিল না—ভাবিল ইহাতেও কি শক্তি চাই? না হইবে কেন?

পুষ্করের নিকটেই প্রভাস তীর্থ। ভদ্রা পূর্ব্ব হইতেই প্রভাসে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। অগ্নির সহিত যুদ্ধ করিতে, ভদ্রা কার্ত্তিক মাসেও ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল—একটু দূরে খোলা ছাদে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইয়াছে—অর্জ্জুন নিকটে আসিলেন। দেখিলেন মুক্তার মত ঘর্ম্মবিন্দু ভদ্রার ভালতটে শোভা পাইতেছে। ভ্রূমধ্যস্থানে সিন্দুরবিন্দু—তাহার দুই পার্শ্বে ঘর্ম্মবিন্দু। শরদিন্দুসুন্দর মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অর্জ্জুন আপ. উত্তরীয় দিয়া সিন্দুর বিন্দুর দুই পার্শ্বের ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিতেছেন—এক হস্ত মস্তকে, অন্য হস্ত কপালের মুক্তা তুলিতে নিযুক্ত। অকস্মাৎ একজন পুষ্করবাসী সেই স্থানে আসিল। অর্জ্জুন একটু লজ্জিত হইলেন। ভদ্রা অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। ভাবিল একটু চাপা দিলেই ত হয়। এত বড় বীর-পুরুষ—কিন্তু একি! ভদ্রা ঝটিতি ভাব সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—প্রভাসে যাইবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছ?

লোক সংবাদ দিয়া গেল—আজ শেষ রাত্রে যাইতে হইবে।

সব প্রস্তুত। লোক চলিয়া গেল। তখন ভদ্রা ও অর্জ্জুন আহারাদি সমাপন করিলেন। আহারান্তে ভদ্রা পদসেবা করিতে করিতে বলিল "প্রভাসে যাইবার আয়োজন করিয়াছি। তোমাকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করি নাই।"

অর্জ্জুন—আমি যাইব না।

ভদ্রা—"নিশ্চয়ই যাইবে"। উত্তর না শুনিয়াই ভদ্রা বাহিরে গেল। পুনরায় আসিয়া বলিল "আর ও প্রভাস হইতে আসিয়াই সাবিত্রী পর্ব্বতে আমায় লইয়া যাইতে হইবে"।

অর্জ্জুন—ভদ্রা! এ জোর কোথা হইতে আসিল?

ভদ্রা—আমার ইচ্ছার জোর নাই। আমার কোন বাসনা জাগিলেই আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি—আমার এই বাসনা যদি তোমার হয়, তবে পূর্ণ হউক। ইহা যখন বুঝিতে পারি তখনই বল পাই। দাসী নিতান্তই তোমার।

অর্জ্জুন—ভদ্রা! পর্ব্বতে ত উঠিতে পারিবে?

ভদ্রা—তোমার সঙ্গে কি না পারি।

(২)

ত্রয়োদশীর রাত্রি। এখনও রাত্রির শেষ প্রহর আসিতে বিলম্ব আছে, সারথি আসিয়া সংবাদ দিল, যান প্রস্তুত। এখনই চলিতে হইবে। ভদ্রা ক্ষণমাত্রেই প্রস্তুত হইল। অর্জ্জুনও উঠিলেন। উভয়ে গিয়া রথে চড়িলেন।

কার্ত্তিক মাস। এখনও তত শীত পড়ে নাই। কিন্তু বাহিরে বড়ই বায়ু বহিতেছিল দেখিতে দেখিতে রথ পুষ্কর পার হইয়া চলিল—প্রভাসের পথে আসিল।

দুই দিকে পর্ব্বত। মধ্যে বালুকাময় পথ। রথ ধীরে ধীরে চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটা বন্য জন্তুর চীৎকার শোনা

যাইতেছে। ভদ্রা শীতে কিছু বিব্রত হইল। অর্জ্জুন ভদ্রার বাসনা বুঝিলেন। ভদ্রা তখন অর্জ্জুনের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল। অর্জ্জুন আপন অঙ্গবস্ত্রের কতক অংশ দিয়া ভদ্রাকে আচ্ছাদন করিলেন। আর ভদ্রার নিদ্রাকর্ষণের জন্য তাঁহার কোমল কেশ মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলী প্রসারণ ও সঙ্কোচন করিতে লাগিলেন। ভদ্রার নিস্তব্ধতা অনুভব করিয়া অর্জ্জুন অনুমান করিলেন ভদ্রা নিদ্রা গিয়াছে।

অর্জ্জুন পর্ব্বতের দিকে চাহিয়াছিলেন। সহসা পর্ব্বতের উপরে এক সুন্দর দৃশ্য দেখিলেন।

শেষ প্রহরে চন্দ্রমা উদিত হইয়াছেন। চন্দ্রদেব পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে আসিলেন। পুষ্কর তীর্থে বরাহ অবতারের কথা প্রচলিত। অর্জ্জুন দেখিতেছেন—পর্ব্বত যেন প্রকাণ্ড বরাহ আকারে দণ্ডায়মান। ঠিক পর্ব্বতের উপরে—চন্দ্রের কলা বড় উজ্জ্বল হইয়া, নীল আকাশে শোভা পাইতেছিল। আর চন্দ্রকলার উপরে—বৃত্তাকারে—চন্দ্রের অল্প অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ শোভা পাইতেছিল। মনে হইতেছিল—যেন ভগবান্ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উজ্জ্বল, শুভ্র দন্তদ্বারা, রসাতলমগ্না পৃথিবীকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন। অর্জ্জুন শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন। ভদ্রা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসিত। অর্জ্জুন ধীরে ধীরে ডাকিলেন "ভদ্রা!" ভদ্রা নিদ্রা যায় নাই। ভদ্রা উঠিয়া বসিল। আর অর্জ্জুন ভদ্রাকে বরাহ অবতার দেখাইলেন। অর্জ্জুন ভগবানের বরাহ অবতারের কথা সুন্দর করিয়া বর্ণনা করিলেন। অর্জ্জুনের ভাবপূর্ণ কথা শুনিয়া ভদ্রা পুনঃ পুনঃ চন্দ্রমা দেখিতে লাগিল। ভদ্রা ভাবিল এত গুণ না থাকিলে দাসী কি আর এত মুগ্ধ হইতে পারে? ভদ্রা আবার শুনিতে চাহিল, অর্জ্জুন দশ অবতারের কথা কহিলেন।

বরাহ অবতারের কথা ভাল করিয়া শুনাইলেন। ভদ্রা আকাশের চাঁদ দেখিয়া বহুবার প্রণাম করিল।

দৃশ্য বড়ই সুন্দর। এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া হয় ত পরবর্ত্তী কবি গাহিয়াছেন—

"বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশবধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে"।

এই কালেও পুষ্করে এই দৃশ্য এখনও দেখা যায়।

রথ বহুদূর আসিল। প্রভাস অতি নিকটে। রাত্রি শেষ হইল। পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল। বায়ু, সমস্ত রজনী ধরিয়া গর্জ্জন করিয়া, প্রভাতে নিস্তব্ধ হইলেন। আর সূর্য্যদেব পর্ব্বতের পশ্চাৎ হইতে আকাশে উঠিলেন।

ভদ্রা অর্জ্জুনের পদধূলি গ্রহণ করিয়া সূর্য্য ও পৃথিবীকে প্রণাম করিল। রথ প্রভাসে আসিল। অগ্রেই ভদ্রা রথ হইতে অবতরণ করিল।

প্রভাস একটি প্রাচীন কুণ্ড—তাহাও প্রস্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত। নিকটেই একটি দেবমন্দির। মন্দিরের মূর্ত্তি বড় মনোহর। চতুর্ভুজ হরি অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় মন্দিরমধ্যে বিরাজ করিতেছেন—যেন কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পার্শ্বে লক্ষ্মী নাই। মন্দিরের সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড প্রাচীন তিন্তিড়ী বৃক্ষ। ভদ্রা অর্জ্জুনকে মন্দিরের মূর্ত্তি দেখাইল। বড় গদগদ ভাষায় ভদ্রা মূর্ত্তির কথা বলিতেছিল।

মন্দির দেখিয়া উভয়ে কুণ্ডের নিকটে আসিলেন। তখন উভয়ে স্নান করিলেন। তীর্থের কার্য্য শেষ হইল। ভদ্রা তীর্থের অধিত্যকায় কতকগুলি ময়ূর দেখিয়া ধরিতে ছুটিল। ময়ূর ধরিতে

পারিল না। ময়ূর দল দ্রুতপদে ছুটিয়া পলাইল, আর ভদ্রা দুইটি সুন্দর ময়ূর পুচ্ছ কুড়াইয়া আনিল। ময়ূর পুচ্ছ কিরীটে পরাইলে কিরীটের বড় সৌন্দর্য্য বাড়িল।

দেখিতে দেখিতে বেলা উঠিল। তখন উভয়ে প্রভাসতীর্থ-বাসীদিগকে বহু ধনরত্ন দানে পরিতুষ্ট করিয়া সাবিত্রী পর্ব্বতের দিকে রথ চালাইতে বলিলেন।

রথ বালুকারাশি ভাঙ্গিয়া সাবিত্রীর নিকটে আসিল। উভয়ে রথ হইতে অবতরণ করিলেন। বহুলোক পর্ব্বতে উঠিতেছে। অর্জ্জুন ও ভদ্রার বেশ দেখিয়া লোকে কত কি ভাবিল। বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে শিব-শক্তিকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। অর্জ্জুন অনায়াসে পর্ব্বতে উঠিতেছেন। ভদ্রা সঙ্গে যাইতে পারে না। অর্জ্জুন মধ্যে মধ্যে ভদ্রার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাতেও হইল না। ভদ্রা আর পারে না। এক পুষ্করবাসী ভদ্রার সাহায্যার্থ আসিল। ভদ্রা অর্জ্জুনের হস্ত ধরিলেন। ভদ্রার কপালে ঘর্ম্ম বিন্দু, শ্বাস ঘন ঘন—অর্জ্জুন ভদ্রার হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলেন। মধ্যে একস্থানে গিয়া বিশ্রাম করিতে হইল। ভদ্রা তখন অর্জ্জুনকে সাবিত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্জ্জুন ব্রহ্মার যজ্ঞের কথা বলিতে লাগিলেন। সস্ত্রীক যজ্ঞ করিতে হয়। যজ্ঞ শেষ হইয়াছে আহুতি দিতে বাকী আছে। সাবিত্রীকে আনিবার জন্য ব্রহ্মা ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন—সাবিত্রী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আসিলেন না—কাজেই ব্রহ্মা গায়ত্রীকে বিবাহ করিয়া যজ্ঞ করিতেছেন—এমন সময়ে সাবিত্রী আসিল। সাবিত্রী সহ্য করিতে পারিল না। অভিমানে সাবিত্রী একবারে পর্ব্বতের শিখর দেশে আসিয়া বসিল। সেই সাবিত্রীই এই। ভদ্রা বলিল "সাবিত্রী পারিল কিরূপে?" অর্জ্জুন সেই

সময়ে একবার অন্যমনস্ক হইলেন ভাবিলেন "তা সে পারে"। ভদ্রা লক্ষ্য করিল অর্জ্জুন আর কোথাও। এতদিন ভদ্রা ইহা লক্ষ্য করে নাই। করিবার কোন অবসর হয় নাই? ভদ্রা দ্রৌপদীর কথা চিন্তা করিল—একটু রঙ্গ করিল বলিল—"সাবিত্রী যদি পর্ব্বতে যান তা ব্রহ্মা কি করেন?" অর্জ্জুন হাসিয়া বলিলেন—"তাত দেখিবেই" আর বিলম্বও ত নাই। তখন উভয়ে পর্ব্বত শৃঙ্গে আসিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন এই দেখ সাবিত্রী কত সুন্দর। উভয়ে মন্দিরের দ্বারে আসিয়াছেন। ভদ্রা সাবিত্রীকে দেখিয়া একটু রহস্য করিল। অর্জ্জুন ভদ্রাকে চারিধার একবার দেখিতে বলিলেন। কি সুন্দর দৃশ্য। তীর্থরাজ পুষ্কর সাবিত্রী হইতে,দর্পণ-দৃশ্যমান একখানি মনোহর চিত্রপটের মত দেখাইতেছিল। দূরে অগস্ত্য পর্ব্বত। ভগবান অগস্ত্য এই পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। অন্যদিকে কহহরা পর্ব্বতমালা। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া ভদ্রা প্রীতি পাইল। পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুনকে ভদ্রা শ্যামল ভূমিখণ্ড-পরিশোভিত তীর্থ-শোভা দেখাইতে লাগিল।

ক্রমে বেলা হইল। তখন উভয়ে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভদ্রা অভিমানিনী সাবিত্রীকে প্রণাম করিল। সাবিত্রী উজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া যেন ভদ্রাকে আশীর্ব্বাদ করিল। ভদ্রা সাবিত্রীকে বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া সাজাইল এবং সাবিত্রী দত্ত সিন্দূর সীমন্তে ধারণ করিল। হস্তে সিন্দূর গ্রহণ করিয়া ভদ্রা একবার অর্জ্জুনের দিকে চাহিল। অর্জ্জুন অভিপ্রায় বুঝিলেন। ভদ্রার নির্ম্মল কপালে সিন্দূরের টিপ বড় সুন্দর দেখাইল। উভয়ে উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ভদ্রা যেন একটু সলজ্জ ভাব ধারণ করিল। অর্জ্জুন ও ভদ্রা পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। মন্দিরের পশ্চাতে মন্দিরের গায়েই গুহা; দুইজন লোক তপস্যা করিতে

পারে এরূপ স্থান। অর্জ্জুন পরীক্ষা করিলেন কেহই নাই। রাত্রিকালে কোন মহাপুরুষ এই গুহায় বাস করেন। মন্দিরের পশ্চাতে অল্পদূরেই এক বৃহৎ কূপ, ভদ্রা কূপের পূজা করিল। উভয়ে পরিশ্রান্ত হইয়া মন্দিরের পশ্চাতে বসিয়াছেন, অকস্মাৎ এক কুমারী ভদ্রার নিকটে আসিল। উভয়ে কুমারীর পূজা করিলেন। কুমারী অগ্রে চলিল আর ভদ্রা অর্জ্জুন সঙ্গে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। অবতরণ কালে ভদ্রার কোন সাহায্যের আবশ্যক হইল না। অর্জ্জুনের বহুপূর্ব্বে ভদ্রা নীচে আসিল।

অবতরণে কাহারও সাহায্য আবশ্যক করে না। নীচে নামিতে কোন ক্লেশ নাই। অধে পতন সহজ। অর্জ্জুন ভদ্রাকে ইহাই বলিতে ছিলেন, ভদ্রা বড় বিষণ্ণ হইয়া অর্জ্জুনের দিকে চাহিতে চাহিতে পথ হাঁটিতে ছিল। রথের নিকটে আসিতে না আসিতেই কণ্টকে ভদ্রার চরণতল বিদ্ধ হইল। ভদ্রা আর চলিতে পারে না। ভদ্রা কণ্টক তুলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। অর্জ্জুন ভদ্রার অলক্ত-রঞ্জিত চরণ গ্রহণ করিলেন। ভদ্রা শিহরিয়া উঠিল। ভদ্রার চরণ কণ্টকশূন্য হইল। দুই এক জন যাত্রী কি যেন কি মনে করিল। আরও মনে করিত যদি জানিত, এই মহাপুরুষ কিরাতরূপী ভগবান পিনাকপাণির সহিত যুদ্ধ করিবেন, এই মহা-পুরুষ নিবাত-কবচাদি বিনাশ করিবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারই সারথ্য করিবেন। আর এই স্ত্রী কৃষ্ণভগিনী, সত্যভামার সখী। এই সুভদ্রাই কলিযুগে জগন্নাথ ও বলভদ্রের মধ্যস্থা। এই সুভদ্রা নিত্যা। চিরদিন ইহারই পূজা চলিবে। অর্জ্জুন ও ভদ্রা রথারোহণে গৃহে ফিরিলেন।

আজ দেওয়ালী। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। আর

চারিদিক দীপমালায় সুসজ্জিত হইল। ভদ্রা অর্জ্জুন সঙ্গে দেওয়ালী ঘাটে আসিয়া বসিলেন। শত শত লোক আসিতেছে, যাইতেছে। শঙ্খ ঘণ্টা রবে চারিদিক মুহুর্মুহু নিনাদিত হইল। সকলেই ভক্তি-ভরে তীর্থরাজকে পূজা করিল, প্রণাম করিল। বহু ধনবান বহু ধন রত্ন দান করিলেন, ক্রমে রাত্রি আসিল। লোক কোলাহল মন্দীভূত হইল। কিছুক্ষণ পরে তীর্থ একবারে লোকশূন্য হইল। অর্জ্জুন ও ভদ্রা তখনও স্থির ভাবে ঘাটে বসিয়া।

চারিদিক দুর্ভেদ্য অন্ধকারে যখন আছন্ন হয় সেই সময়ে, একবার বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন উহা আপন আধার মেঘকে প্রকাশ করে, সেই বিদ্যুৎ যেন আজ নবীন জলধর অঙ্গে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুটস্থ মধ্যে সাধকের অভীষ্ট মূর্ত্তি স্থির হইয়া দাঁড়াইলে যেমন মনোমুগ্ধকর চমৎকৃতি উপলব্ধি হয়—পুষ্কর তীর্থে দেওয়ালী ঘাটে এই মূর্ত্তিও সেইরূপ চিত্তবিশ্রান্তিকর। ভদ্রা ও অর্জ্জুন নিতান্ত শান্ত; মুখে কোন কথা নাই। যেন মূর্ত্তি দুটি চিত্রে আঁকা। যেন উভয়ে অন্য কোন রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, দেহ দুইটি যেন এই পুষ্করে পড়িয়া রহিয়াছে। কতক্ষণ এই ভাবে গিয়াছে কাহারও মনে নাই। যখন উভয়ে সজাগ হইলেন, তখন দেখিলেন, ঠিক জলের সন্নিকটে আর দুইটি মূর্ত্তি। যেন ভদ্রা ও অর্জ্জুনের প্রতিচ্ছায়া। উভয়েই সন্ন্যাসী সাজিয়াছে। দুইটি ঘৃতের প্রদীপ উহারা পুষ্করে ভাসাইয়া দিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহাই দেখিতেছিল। প্রদীপ দুইটি এক সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে গভীর জলে গিয়াছে, সহসা একটি জলে ডুবিল। স্ত্রী মূর্ত্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ তোমার দীপ নিবিয়া গেল।" স্বামী বলিল "তোমারই অগ্রে নিবিল।" দেখিতে দেখিতে ইহাদের হৃদয়ের ভাব অন্যরূপ হইল। উভয়ে যেন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল—

ভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল—হঠাৎ ইহাদের রঙ্গ থামিয়া গেল কেন? অর্জ্জুন বলিলেন—ইহাদের কোন একটি যে অগ্রে নির্ব্বাপিত হইবে ইহা ইহারা চায় না। কাহাকেও রাখিয়া কেহ যে যাইবে ইহা ইহারা সহ্য করিতে পারে না। ভদ্রা বলিল আমিও ত ইহা চাই।

তৃতীয় কথা।

আনন্দোস্থিতি-লীলা-কৌতূহল-পতন।

জীবন কি? ইহা কি জাগ্রত স্বপ্ন ঘটনা অথবা স্বপ্ন-জাগ্রত ঘটনা? কোনটি সত্য? জাগ্রত না স্বপ্ন? স্বপ্ন, ভোগকালে সত্য মনে হয়, কিন্তু জাগ্রতে মিথ্যা। আবার জাগ্রত ও ভোগ কালে সত্যমত, কিন্তু স্বপ্নকালে মিথ্যা। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা কোন বস্তু বিশেষের স্বরূপ নহে। স্বপ্নে ব্যাঘ্র দর্শন হইল ইহা পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাঘ্র নহে। বস্তুটিই স্বপ্নে দেখা যায়। স্বপ্ন ভঙ্গে বুঝিতে পারা যায় কোন জীবন্ত ব্যাঘ্র দেখা হয় নাই। মিথ্যা কল্পনা দেখা হইয়াছিল। জাগ্রত কালে ও যাহা দেখা যায়, তাহা যদি কোন কিছুর স্মৃতি হয়, কোন কিছুর প্রতিচ্ছায়া হয়, তবে বলা যাইতে পারে ইহার মূলে কোন সত্য বস্তু আছে। যদি তাহা না হয়—যাহা দেখি তাহাই দেখি, তবে জীবন এক মহাস্বপ্ন। বহুদিন ধরিয়া—বহু বার ধরিয়া একই স্বপ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে সত্য মত বোধ হইয়া যায়। সর্ব্ব জাতির মহাপুরুষ ইহা অনুভব করিয়াছেন—তাই সকলেই বলিয়াছেন "জীবনটা স্বপ্ন এবং বিস্মৃতি। আমাদের ক্ষুদ্র জীবন বেষ্টন করিয়া এক মহাস্বপ্ন ভাসিতেছে"।

সত্য-স্বরূপ ভগবানকে পাইলে, যখন জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়, তখনই জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়—জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বুঝিতে পারা যায় "আমি" "আমার" পূর্ণ জীবন ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্যের সম্মুখে না আসিলে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। তাই অজ্ঞ জনে ধারণা করিতে পারে না, জীবন স্বপ্ন কিরূপে?

অদ্ভুত প্রহেলিকা। স্বপ্নমধ্যে নিদ্রা আইসে, আবার সে নিদ্রাতে স্বপ্ন দেখা যায়। অজ্ঞ জীব নিদ্রাকালে যে স্বপ্ন দেখে, তাহা স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন।

ভদ্রা দেওয়ালীর রাত্রিতে গৃহে আসিয়া বিশ্রাম লাভের চেষ্টা দেখাইল। অর্জ্জুন স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, ভদ্রা অর্জ্জুনের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া যেমন শয়ন করিল, আর দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ভদ্রা স্বপ্ন দেখিল। অদ্ভুত সে স্বপ্ন। স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন। হায় মানব কিরূপে কি বুঝিবে? শব্দে শুনি এ জগৎ তিনি গড়িয়াছেন, শুনি এই বিচিত্র সৃষ্টি ও তাঁহার "স্বয়মন্থইবোল্ল-সন্" স্বয়ং তিনি—তিনি স্বয়ং অন্যমত হইয়া থাকেন। অন্যমত হওয়াই তাঁহার উল্লাস। স্থির সমুদ্র বক্ষে চঞ্চল তরঙ্গমালার মত, তিনি আপন চিদাহ্লাদিনী শক্তিতে, আপন প্রশান্ত বক্ষে, এই অশান্ত ভূতসমূহ যেন সৃষ্টি করেন। প্রতি সৃষ্ট বস্তু দেখিয়া "আহা এই আমি" এই বলিয়া যেন আত্মাভিমান করেন। ইহাই তাঁহার উল্লাস। আপনা ভুলিয়া যেন জীবভাবে বদ্ধ হওয়াও তাঁহার উল্লাস।

জীব বদ্ধ হইলে কি এক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ভগবান্ অন্তর্যামী—ভগবান সর্ব্বদা সঙ্গে—ভগবান "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" সমস্তই দিতেছেন, সমস্তই দিয়া থাকেন—তবু জীব

কিছুই পায় না, তবু জীব কিছুই নাই বলিয়া হাহাকার করে। হায়! জীব কতই ভ্রমে ভ্রমণ করে। জীব মনে করে, তাহাকে কত কষ্টই না জানি ভোগ করিতে হইবে, কত পরীক্ষাই দিতে হইবে, কত ভোগই ভুগিতে হইবে। কত ক্লেশ করিয়া ইহাকে অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। ভগবান ভিন্ন কেহইত মুক্তি দিতে পারে না, তাঁহাকে ডাকা চাই। জীব অজ্ঞানে কত বিলাপ করে। অজ্ঞানে দুঃখ মধ্যে পড়িয়া কতই চীৎকার করে। কতবার বলে কোথায় তুমি প্রভু! তুমি কবে আসিবে? তুমি কবে আমায় উদ্ধার করিবে? আমি যে আর এ যাতনা সহিতে পারি না। এস প্রভু! আমার যে দুঃখের অন্ত নাই। হায়! কি ঘোর অজ্ঞান! কণ্ঠে চামীকর ধারণ করিয়া জীব "হার কে চুরি করিল?" বলিয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করে—নাভি-দেশে কস্তুরি ধারণ করিয়া ভ্রমান্ধমৃগের মত, মৃগনাভিকস্তুরী সন্ধানে দিক্‌বিদিক্ ছুটাছুটি করে। কত কর্ম্ম করে, কত অন্যায় করে, কত পাপ করে—কত কাঁদে, কত হাহাকার করে। তৃষ্ণার্ত্ত পক্ষী, সরোবর তীরে, শূন্য স্থানে ধৃত আঠাকাটিতে, জল পানার্থ উপবেশন করে। জলপান জন্য যত বার পক্ষ বিধূনন করে, ততই আঠাতে তাহার পক্ষ জড়াইয়া যায়, পাখী আর উড়িতে পারে না—তখন ব্যাধ হস্তে পড়িয়া প্রাণ হারায়। হায় মৃত্যু-ব্যাধ কত জীব-পক্ষীকে নিরন্তর এইরূপে ধরিতেছে। জীব কতই কর্ম্ম করে, কর্ম্মের কৌশল জানে না, কর্ম্মের কৌশল শিক্ষা করে না, কর্ম্মের কৌশল অভ্যাস করে না, তাই প্রতি কর্ম্মে সে জড়াইয়া যায়, প্রতিকর্ম্মে তাহার বন্ধন ঘটে, কর্ম্ম বন্ধন কাটিতে চায়, পারে না। দুর্দ্দান্ত মন, শত বাসনা তুলিয়া, তাহাকে বলিয়া দেয়, দেখ এই বাসনা সমূহই তোমার প্রভু। জীব বাসনা-জালে

জড়িত হইয়া কিছুতেই চিত্ত স্থির করিতে পারে না, কিছুতেই শান্তি পায় না, এইরূপে কতবার জন্মে, কতবার মরে, আবার জন্মে, আবার মরে—হরি হরি! এ দুঃখের অন্ত কোথায়? কি করিলে এ দুঃখ দূর হইবে? কি করিলে জীব আপনার স্বরূপ বুঝিবে? কি করিলে এই স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন, তাহার ভিতর স্বপ্ন, এই স্বপ্ন মায়া দূর হইবে? কি করিলে এই সংসারাড়ম্বর ভেদ করিয়া আপন স্বরূপে শান্ত হইবে? আনন্দময়, আনন্দভুক্, বিজ্ঞানঘন-সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামী, কি করিলে জাগ্রত-অভিমান স্বপ্নে, স্বপ্নাভিমান সুষুপ্তিতে, সুষুপ্তি সেই তুরীয়ে, সেই চতুর্থে, লয় পাইবে—কবে আপন পরম শান্ত, আনন্দ স্বরূপে, নিত্য অনুভব করিবে? হায় কবে এই মহাস্বপ্ন ভাঙ্গিবে?

ভদ্রা কি আমাদিগকে এই স্বপ্ন ভঙ্গের কোন সংবাদ দিতে পারিবে? কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে? ভদ্রা কি আমাদিগকে আমাদের কোন আত্ম-পরিচয় দিতে পারিবে? ভদ্রাই জানে। আমরা কিন্তু ভদ্রার স্বপ্নের ভিতর স্বপ্নের বিবরণ বলিতে যাইতেছি।

ভদ্রা স্বপ্নে দেখিল যেন ভদ্রা অর্জ্জুন, এক অপূর্ব্ব বেশে, অপূর্ব্ব দেশে গিয়াছেন। পরম শান্ত ধামে উভয়ে পরম আনন্দে ভাসিতেছেন। যেন আর কোন আয়াস নাই। চক্ষুর উন্মেষ নিমেষের ক্লেশ পর্য্যন্ত নাই। সর্ব্ব প্রকার আয়াসের শান্তি জন্য উভয়ে আনন্দময়, উভয়ে আনন্দভুক্। এই মাত্র উভয়ে যেন আরও কোন ঊর্দ্ধধাম হইতে নামিয়া আসিয়া, এই আনন্দ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই ঊর্দ্ধধামে কি অবস্থা ছিল, তাহা যেন বলিবার ভাষা নাই। যে ধামে ছিলেন, সেখানে সূর্য্য ভাসেন না, শশাঙ্ক নাই, অগ্নি নাই। তথাপি ধাম প্রকাশিত। কার প্রকাশে

প্রকাশিত বলা যায় না। সে ধাম বুঝি স্বপ্রকাশ। সেই ধামে ভদ্রা ও অর্জ্জুন কোন্ রূপে ছিলেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। দুয়ে এক, তথাপি একই দুই। যিনি যে ভাবে দেখেন তাঁহার নিকটে তাহাই। এক অপ্রাকৃত দেহ, কেহ দেখিতেছেন পুরুষ, কেহ দেখিতেছেন প্রকৃতি। শক্তি শক্তিমানে জড়িত। শক্তি শক্তিমান হইতে অভিন্ন। এই মাত্র খেলা করিবার বাসনা জাগিল—উভয়ে খেলার জন্য এই আনন্দ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। ঊর্দ্ধ দ্বার দিয়া মন্দিরে নাবিয়াছেন। ভদ্রা দেখিতেছে, কি এক আনন্দরশ্মি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহকে রশ্মিমান করিতেছে। কোন এক অন্ধকার গৃহের, কোন সূক্ষ্ম গবাক্ষ ছিদ্র দিয়া, সূর্য্যালোক প্রবেশ করিলে, সেই গৃহের, সেই স্থানের অন্ধকার বিনাশ করিয়া যেমন ঐ আলোক দণ্ড ভাসিতে থাকে, আর সেই আলোক রেখার মধ্যে যেমন অসংখ্য ত্রস রেণু ভাসিয়া বেড়ায়, ভদ্রা দেখিতেছে, উপরের একটি মাত্র সূক্ষ্ম মুখ দিয়া গৃহ মধ্যে যে রশ্মি প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে কত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যেন ভাসিতেছে। ভদ্রা মন্দিরের চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। মন্দিরের উপরে একটিমাত্র দ্বার, কিন্তু নিম্নে বহু মুখ। ভদ্রা গণনা করিতেছে এক, দুই, তিন—ঊনবিংশতি। ভদ্রা অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিল নিম্ন দ্বার দিয়া কোথায় যাওয়া যায়?

অর্জ্জুন—এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে। কিন্তু সে রাজ্যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই—সে রাজ্যে একবার প্রবেশ করিলে, মনে হইবে, সে রাজ্য বিশাল, সে রাজ্য সীমাশূন্য।

ভদ্রা—আমি দেখিব?

অর্জ্জুন—যাইও না।

ভদ্রা—গেলে আর কি হয়? এখনি ত আসিব। এই টুকু কি আর সহিতে পার না?

অর্জ্জুন—যাইও না।

ভদ্রা—তোমার কথায় আমার বড়ই আগ্রহ জাগিয়াছে। আমি একবারটি দেখিয়াই এখনি আসিব। তোমার নিমেষ পড়িতে না পড়িতেই আসিতেছি।

অর্জ্জুন—যাইও না।

ভদ্রা—আমিত কখন তোমার অবাধ্য নই। তোমার অবাধ্য হইয়া এই ভদ্রা নামে পরিচিত হইতেও ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমি একবার দেখিব। ভদ্রার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছে।

হায়! এই কৌতূহলই যে দুরত্যয়া মায়া—দেবতার এই কথা বুঝিতেও প্রাণান্ত হয়, ছার জীবে কি বুঝিবে? দেবতাও আত্মমায়ায় ভিতরের বস্তু, বাহিরে দেখেন, মানুষের কথা কি?

ভদ্রা চলিল, অর্জ্জুন বাধা দিলেন না।

মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়াই ভদ্রা দেখিল, মণ্ডপটি একটি বৃক্ষতলে যেন অবস্থিত। মণ্ডপের নিম্নেই চন্দ্রকলার মত শীতল আলোক রেখা, অর্দ্ধবৃত্তাকারে মণ্ডপের দুই পার্শ্ব দিয়া কোন্ অনন্ত প্রদেশে যেন মিশিয়াছে। মণ্ডপ যেন ঐ চন্দ্রদলের উপর স্থাপিত।

মধ্যস্থানে বৃক্ষতলে মণ্ডপ আর চরিদিকে বহুদূর ব্যাপি এক চতুষ্কোণ স্থান। তাহার চারিধারে এক বিশাল প্রাকার। প্রাকারের পরে পরিখা। ভদ্রা মধ্যস্থলের বৃক্ষ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে। কি এক অব্যক্ত মধুর ধ্বনি বৃক্ষের পত্রে পত্রে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ করিতেছে। বৃক্ষের বৃহৎ শাখা চারিটি। শাখায় শাখায় প্রশাখা। প্রশাখা সকলের শেষ ভাগে আরও

কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা। শাখায় শাখায় পত্র। পত্রে পত্রে যে অপূর্ব্ব মধুর শব্দ উঠিতেছে, মনে হয় যেন কোন মদজলকল্লোল-লোচনা দয়মান-দীর্ঘ-নয়না সঙ্গীত মাতৃকা চারি হস্তে বীণা গ্রহণ করিয়া, আপন মনে বীণা বাদন করিতেছেন। আর বীণা নখ-মুখ-মুখরিত হইয়া যে আনন্দ উদ্গার করিতেছে, মনে হয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাদিনী বেদময়ী যেন মৃদু মৃদু শিরঃ কম্পন করিতে করিতে তাহাই আস্বাদন করিতেছেন।

ভদ্রা এই উদ্যান-কেলীকলকণ্ঠিকে প্রণাম করিয়া আগম-বিপিন-ময়ূরীর ন্যায় উদ্যান শোভা দেখিবার জন্য ছুটিল। দেখিতে দেখিতে চতুষ্কোণ বাটিকার পূর্ব্বকোণে আসিল। সেখানে আর একটি বৃহৎ বৃক্ষ, তাহার চারি পার্শ্বে সেই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ বাটিকা। সেই সমস্ত বৃক্ষ দেখিয়া মনে হয় যেন স্পর্শ-কোমলতার মূর্ত্তি ইহারা। এই সমস্ত বৃক্ষ হইতে একোনপঞ্চাশৎ বায়ুস্কন্ধের বিস্তার হইতেছে। ভদ্রা উত্তর কোণে আসিল সেখানে অন্য প্রকারের বৃক্ষবাটিকা মধ্যে সেই জাতির এক বৃহৎ আলোক বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষ সমূহের পত্রে পত্রে বিচিত্র বর্ণ ঝল মল করিতেছে। সূর্য্য কিরণে কাচখণ্ড ধরিয়া, তন্মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে, বৃক্ষে বৃক্ষে যে বর্ণ প্রতিফলিত দেখায়, এইখানে সমস্ত বৃক্ষ স্বভাবত সেইরূপ। যেন বৃক্ষসমূহ সূর্য্য-কিরণ-মণ্ডিত কাচ-নির্ম্মিত প্রাকা-রের মধ্যেই সর্ব্বদা অবস্থিত। ঐ আলোক বৃক্ষ হইতে যেন সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ, প্রভৃতি তেজের উৎপত্তি হইয়াছে। ভদ্রা পশ্চিম কোণে আসিল। সেখানকার বৃক্ষ সমূহ রসাল ফলে পূর্ণ। বৃক্ষ-বাটিকা সমূহ রসাল ফলে সরসবতী। ইহা যেন পৃথিবীর সমস্ত দ্রব পদার্থের কারণ। ভদ্রা তখন দক্ষিণ কোণে আসিল। কি সুন্দর গন্ধ! চারি দিকে পুষ্প, পুষ্পবাটিকা। পুষ্পবাটিকার

সর্ব্বত্র স্তবকে স্তবকে পুষ্প—কোনটি প্রস্ফুট, কোনটি প্রস্ফুটনোন্মুখ, কোনটি অর্দ্ধস্ফুট। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে কত কত গুঞ্জনরত মধুব্রত মকরন্দ গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া উড়িয়া উড়িয়া খেলা করিতেছে—কত প্রজাপতি চিত্র বিচিত্র পক্ষ বিস্তার করিয়া উদ্যান দেবতার মনোরঞ্জন করিতেছে। ভদ্রা সেই মনোহর উদ্যানে দেখিল কত সুন্দরী হাস্যময়ী, নৃত্যময়ী, দৈবকন্যা নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে কত কোকিল বধূ দিক্‌বিদিক্ নিনাদিত করিয়া গান করিতেছে। কত ভীমরাজ, কত পাপিয়া, কুঞ্জে কুঞ্জে ঝঙ্কার করিতেছে। স্থানে স্থানে কত ময়ূরী, আপন ময়ূরকে রঙ্গ দেখাইতে, বিচিত্র পক্ষ বিস্তার করিয়া, উন্মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কত হরিণ, কত হরিণী যেন কোন লোচন-বিজিত কুরঙ্গীর ক্রীড়াহ্লাদ জন্য ইতঃস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে উপবেশন জন্য কত কত রত্নবেদিকা। স্থানে স্থানে কুমুদ কহ্লার পরিপূরিত কত সরোবর। কত কত হংস, কারণ্ডব, আনন্দে সাঁতার দিতেছে, মনে হয় যেন ভগবৎ লীলা-সাগরে ভক্তগণ ক্রীড়া করিতেছেন। এই সমস্ত সরোবর, দুইটি কলনাদিনী নদীর জলে সর্ব্বদা জলপূর্ণ থাকিত। সচ্ছসলিলা নদী, কুল কুল শব্দ করিয়া, উদ্যানের বাহিরের দুই পার্শ্ব দিয়া, যেন কোন সীমাশূন্য প্রদেশে লীন হইতেছে। নদীর কুল কুল ধ্বনি যেন মধুর কথা কহিয়া বলিয়া দিতেছে পঞ্চবটী মধ্যবর্ত্তী মণিমণ্ডপে স্থিতি লাভ কর।

ভদ্রা বিহ্বল হইয়া উদ্যান প্রাকার পর্য্যন্ত আসিল। কৌতূহল আরও বাড়িল। একটু বিস্মৃতিও ঘটিল। "যাইওনা" বাক্য ভদ্রা একবারে ভুলিল। প্রবল উৎসাহে ভদ্রা পরিখার বাহিরে আসিল। ভদ্রার মনে হইল কে যেন ভদ্রাকে ইঙ্গিত করিতেছে,

কে যেন বলিতেছে "আরও চল"। ভদ্রা যেন কাহারও পশ্চাতে ছুটিতেছে। ভদ্রা এখন যেখানে আসিল সেখানে যেন এক সীমা-শূন্য শব্দবৎ নীল আকাশ সমন্তাৎ বিস্তারিত। কোন রূপ নাই কোন স্পর্শ নাই শুধু শব্দ। ভদ্রা আরও দূরে আসিল। সেখানে কি যেন স্পর্শ সীমায় আসিতেছে, কি যেন নিরন্তর গর্জ্জন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ভদ্রা যেন সেই প্রবাহ মধ্যে পড়িয়া আরও দূরে বিতাড়িত হইয়া আসিল। এই স্থানে কি এক অপূর্ব্ব রূপ-রাশি চক্ষু যেন ঝলসাইয়া দিল ভদ্রা দেখিল সে স্থান জ্বালামালায় পূর্ণ। যেন নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চমকাইতেছে। ভদ্রা ইহা সহ্য করিতে পারিল না। সেই অস্পষ্ট মূর্ত্তি যেন তাহাকে আরও দূরে আনিল। এখানে চারিদিকে জলকণারমত কি যেন যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ভদ্রা ইহাও পার হইয়া আসিল। এখন যে স্থানে আসিল সে স্থানে যেন রেণুর মত কোন সূক্ষ্ম পদার্থ পুঞ্জীকৃত। এ স্থান যেন বড় স্থূল। চারিদিকে কিসের যেন গন্ধ। ভদ্রা যেন স্থূলে আসিয়া বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিল।

ভদ্রা এখন বহুদূরে। ভদ্রা ভীত হইয়াছে। ভদ্রা ভাবিল এ কোথায় আসিলাম? আর যাইব না। ভদ্রা দাঁড়াইল। অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিল এক বিকটাকার দীর্ঘকায় কৃষ্ণ কলেবর দস্যু। এই ভীষণ অন্ধকারতুল্য পুরুষ দেখিয়া ভদ্রার হৃৎকম্প হইল সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রার অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত হইল। ভদ্রা ভিতরে গর্জ্জিয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে যেন ভদ্রা কিছুই করিতে পারে না। কৃষ্ণ-কায় দস্যু ভদ্রার অতি নিকটে। ভদ্রা কি যেন আশঙ্কা করিল। আলুলায়িতকুন্তলা ভদ্রা কুপিত ফণিনীর ন্যায় সগর্ব্বে রোষ দৃষ্টিতে দস্যুর প্রতি চাহিল। দস্যু ভদ্রার সরোষ ব্যবহারে ভ্রূক্ষেপ

করিল না—না করিয়া ভদ্রার চক্ষে তীব্র দৃষ্টিপাত করিল আর অট্ট অট্ট হাস্য করিল। পরে বিকটস্বরে ডাকিল "ভর্গা"। তেজস্বিনী ভদ্রা দস্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া স্থান ত্যাগ করিতে চায়—ভদ্রা পারিল না। ভদ্রা দেখিল যেন সে কিসে অভিভূত হইতেছে। দস্যু অন্য কোন কথা কহিল না। কেবল একবার আপন দীর্ঘ হস্ত উত্তোলন করিল। পশ্চাতে দীপ রাখিয়া হস্ত উত্তোলন করিলে সম্মুখে হস্তের ছায়া অতি বৃহৎ দেখায়। দীর্ঘকায় কৃষ্ণ কলেবর দস্যুর হস্তচ্ছায়া ভদ্রার শরীর স্পর্শ করিল। ভদ্রার মনে হইল ভদ্রা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

ঐ অবস্থায় ভদ্রা দেখিতেছে ভদ্রা অবশ হইয়া দস্যুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। ভদ্রা মন্ত্রমুগ্ধবৎ। অন্তরে বিলক্ষণ বোধ আছে এটা দস্যু ইহার অনুসরণ করিব না—এ কোনা কুস্থানে আমায় লইয়া যাইতেছে, কিন্তু ভদ্রা আপনাকে আপনি বশীভূত করিতে পারিল না। যাহা করিতে একবারেই প্রাণ চায় না ভদ্রা তাহাই করিল। ভদ্রাকে লইয়া দস্যু এক প্রকাণ্ড পুরীর নিকটে আসিল। ভদ্রা ভাবিল এই দস্যুর পুরী।

ভদ্রা দেখিতেছে এক প্রকাণ্ড পুরী। এই পুরীর প্রতি গৃহ একই প্রণালীতে গঠিত। দস্যু ভদ্রাকে লইয়া এক বৃহৎ ভবনে প্রবেশ করিল। অহো! কি ঘৃণিত ক্লেদপূর্ণ দ্বার দিয়া দস্যু চলিয়াছে। ভদ্রা বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া একবারে যেন চৈতন্য-শূন্য হইয়া পড়িল। মনে হইতে লাগিল দস্যু যেন ভদ্রাকে চর্ম্মপাত্রস্থিত ঈষদুষ্ণ রুধির জলে স্নান করাইল।

ভদ্রার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। ভদ্রা স্মরণ করিতে পারে না ভদ্রা কে? কোথায় ছিল? কোথা হইতে আসিল? ভদ্রা যেন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারে না। কি করিবে?

কোথায় যাইবে ? কেন করে? ভদ্রা কি এক অনিশ্চিত অবস্থায় যেন পড়িয়াছে। ভদ্রার যেন সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে বসন ভূষণ নাই, সে রূপ নাই। ভদ্রা নিরাভরণা, ভদ্রা দীনা, ভদ্রা বড় দুঃখী হইয়া পড়িল। হায়! ভদ্রা যেন এ পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিতে পারিল না। কষিত কাঞ্চনের মত লাবণ্য কোথায় গেল ? পীত কৌষের বাস কে অপহরণ করিল ? অঙ্গের অলঙ্কার কে চুরী করিল ? সে কেয়ূর কঙ্কণ কিরীট কে কাড়িয়া লইল ; কে যেন বলপূর্ব্বক ভদ্রার বাহুর কঙ্কণ মণি বিদলিত করিয়া ভগ্ন করিয়াছে, কে যেন কেশপাশ আকর্ষণ করিয়া চূড়ারত্ন গ্রহণ করিয়া ভদ্রাকে তিরস্কার করিয়াছে। ভদ্রা আজ যেন নিতান্ত অনাথিনী। ভদ্রার যেন আর পূর্ব্বের কিছুই নাই আছে কেবল দুঃখ।

দস্যু ভদ্রাকে লইয়া যে গৃহে প্রবেশ করিল তাহা ত্রিতল। সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ, ভদ্রা দূর হইতে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা যেন সুন্দর। উপরে ঐ গৃহ বহুদ্বারে সজ্জিত। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠ যেন বাহিরে আবৃত। যেন কোন প্রকাশ্য দ্বার নাই। দস্যু গুপ্ত দ্বার দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আর এখন দস্যু ভদ্রাকে মধ্য প্রকোষ্ঠে আনিল। ভদ্রাকে ঐ গৃহে একাকিনী রাখিয়া কোন্ পথে বাহিরে আসিল ভদ্রা জানিল না। দস্যু চলিয়া গেল। ভদ্রা বুঝিল সে দস্যু কারাগৃহে বন্দিনী।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কত বার রাত্রি আসিল, কত বার রাত্রি কাটিল ; কত বার চাঁদ উঠিল, কত বার চাঁদ ডুবিল ; ভদ্রার দুঃখ আর ঘুচিল না। ভদ্রার জন্য বহু দাস দাসী নিযুক্ত হইল, কিন্তু ভদ্রার শান্তি কিছুতেই নাই। সকলে ভদ্রাকে "ভর্গা" বলিয়া ডাকিত। ভদ্রা জানিল তাহার নাম "ভর্গা"।

সেই দস্যু করাবাসে কত লোক ভদ্রার সহিত পরিচয় করিল; কত আসিল, কত গেল; কিন্তু ভদ্রার অসুখ সারিল না।

লোকের ব্যবহার দেখিয়া ভদ্রা ভিতরে সাবধান হইল। প্রথম প্রথম মিষ্ট কথায় ভুলিত। কিন্তু বহুবার প্রতারিত হইয়া ভদ্রা ভিতরে আর কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। বাহিরে যে যেমন তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে শিখিল।

যে সমস্ত দাস দাসী, যে সমস্ত বাহিরের লোক ভদ্রার নিকট আসিত, তাহাদের মধ্যে একজনের প্রতি ভদ্রা একটু আকৃষ্ট হইল। ক্রমে উভয়ের একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। এ ব্যক্তি গোপনে সময়ে সময়ে ভদ্রার সহিত দেখা করিত। বিশেষ পরিচয় কিন্তু কিছুই হয় নাই।

শেষ কথা।

ভোগক্ষয়—মুক্তি।

ফাল্গুন মাস শুক্ল পক্ষ। পূর্ণিমা আসিতে দুই চারি দিন অবশিষ্ট আছে।

আজ আকাশে চাঁদ উঠিল না। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। রাত্রি অন্ধকার। ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অসময়ে রাত্রি বর্ষাকালের মত অভদ্র হইল।

ভর্গা আপন গৃহে একাকিনী। কত কি ভাবিতেছে। ভাবনারও কোন শৃঙ্খলা নাই। সাধারণ লোকে মন স্থির করিতে চেষ্টা করিলে যেমন তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু চিন্তা তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলে ভর্গারও তাহাই হইতেছে। এক ভাবিতে আর

আইসে আবার তাহাও থাকে না। কোন কিছুই মীমাংসা হয় না। কেন ভর্গার এই দুর্গতি ইহাও ভর্গা বুঝিতে পারে না। ভর্গা কি কোন পাপ করিয়াছে? ভর্গা কি কোন অপরাধ করিয়াছে—যাহার জন্য এই ক্লেশ পায়? ভর্গার কিছুই স্মরণ হয় না। কবে কি করিলাম কেন এই কুসঙ্গে পড়িলাম? কেন কিছুতেই সুখ পাই না? সকলি ত করি কিন্তু কেন করি? সবই ত আছে কিন্তু তৃপ্তি কৈ? ভর্গা আপনার অবস্থা দেখিয়া ক্রমেই বিষণ্ন হইয়া পড়িতেছে। দিনের পর দিন যায় কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক যাতনা, সেই এক দুঃখ, সেই এক হা হুতাশ। ভর্গা কত কি ভাবিল। সহসা নীচের গৃহ হইতে চাৎকার ধ্বনি উঠিল। ভর্গা মনে করিল বুঝি দস্যুগণ আবার কাহার সর্ব্বনাশ করিল। এই দস্যুগৃহে কত নর নারী আজ ভর্গার মত যাতনা পাইতেছে। হায়, ইহাদের কি হইবে? হায়, কে ইহাদিগকে উদ্ধার করিবে? ভদ্রা ভীত হইল। ভাবিল হায় আমার কি হইবে? কেই বা আমায় উদ্ধার করিবে? এখানে আমার আপনার কে আছে? আমি যে কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। হায়, বিশ্বাস করিলেই ত প্রতারিত হই। সকলেই ত আত্মীয়তা করে। কিন্তু দুঃখের কথা ত কেহ শুনিতেও চায় না। মুক্তির কথা ত কেহই বলে না। ইহারা কত মিষ্ট কথা কয়। মিষ্ট কথায় যেন সর্ব্বদা আমাকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়। ভুলাইয়া ইহারাই আমাকে কুপথে লইয়া যায়, আবার ইহারাই আমার দোষ দেয়। এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ স্থানে আর কতদিন থাকিব? ভর্গার তখন সেই নব পরিচিতের কথা মনে পড়িল। সে ত বড় দয়াময়ী। কিন্তু সেও কি আমায় প্রতারণা করে? ভদ্রা আপনাকে আপনি তিরস্কার করিল। বলিল আমি নিজের উপর অবিশ্বাস করিতে

পারি কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাস করি কিরূপে? সে আমায় কত স্নেহ করে; আমার জন্য সে কত ব্যাকুল। হরি হরি! সেই দেবী মূর্ত্তি—তাহাকে অবিশ্বাস করিতেও আমি চাই—অবিশ্বাস ক্ষণতরেও মনে স্থান দিয়া কত অন্যায় করিয়াছি। আর আমি তাহাকে অবিশ্বাস করিব না। আমি সকল লোকের সহিত তাহার তুলনা করিয়া দেখিয়াছি। আমাকে দেখিয়া এত হর্ষগদ্‌গদ হইতে কাহাকেও দেখি নাই। কি করিলে আমি উদ্ধার পাইব একথা সে ভিন্ন কেহই যেন ভাবে না। সে যেন কি আমাকে বলিতে চায়, তাই আজ আসিতে চাহিয়াছে। আজ তাহাকে আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব। তাহাকে একবারও সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়া ক্ষমা চাহিব। কখন সে আসিবে?

ভর্গা আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। ঝম ঝম শব্দে বৃষ্টির শব্দ কর্ণে আসিতেছে। সেই সঙ্গে ভর্গা শুনিল দ্বার দেশে কে মৃদু মৃদু আঘাত করিল। ভর্গা সতর্ক হইয়া শুনিল—আবার তাই। ভর্গা বুঝিল সে আসিয়াছে—আহ্লাদিত হইল—ধীরে ধীরে দ্বারের নিকটে আসিল—ধীরে ধীরে দ্বার উন্মোচন করিল, দেখিল সেই—ভর্গার হৃদয় দুর দুর করিয়া উঠিল। তখন ভর্গা তাহাকে গৃহমধ্যে আনিয়া নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিল।

ভর্গা গৃহমধ্যস্থিত আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিল। পরক্ষণেই পার্শ্বের গৃহে কোলাহল শব্দ উঠিল, ভর্গা শুনিল যেন কেহ তাহার দ্বারদেশে আঘাত করিতেছে।

ভর্গা আগন্তককে শয্যাতলে আবৃত রাখিয়া দ্বার দেশে আসিল—দ্বার খুলিল। বড় শব্দ করিয়া দ্বার খুলিল, জানাইল, ভর্গা যেন কতই বিরক্ত হইয়াছে। ভর্গা যেন মনে মনে বলিল তোমাদের

কি সময় অসময় নাই। এক দাসী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। ভর্গা বুঝিয়াছিল তাহার দাস দাসীগণ নামে মাত্র দাস দাসী। তাহারা ভর্গার কথা শুনিত, কিন্তু নিজের মতলবে কার্য্য করিত। কিছু বলিলেই তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার করিত—আবার কিন্তু সেইরূপ কার্য্যই করিত। ভর্গা বুঝিয়াছিল—ইহারা তাহার উপর প্রভুত্ব করে। ভর্গা বুঝিয়াছিল দস্যুর আজ্ঞানুসারেই ইহারা এইরূপ করে। দাসী যেন কতই কার্য্যের ভাণ দেখাইল। একবার চারিদিক দেখিয়া কি একটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল—জানাইয়া গেল এই প্রয়োজনেই আসিয়াছিলাম। ভর্গা বুঝিল দাসী কোন কিছুই দেখে নাই।

দাসী চলিয়া গেল—ভর্গা যেন বড় নিশ্চিন্ত হইল। ভাল করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় আসিল। তখন উভয়ে আলোকের নিকট এক আসনে আসিয়া বসিল। ভর্গা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল—

তুমি কে ভাই?

আমি তিশ্রা।

তিশ্রা কি?

তুমি যেমন ভর্গা।

তিশ্রা তোমার নাম? তুমি কেন ভাই আমার সহিত সরল ব্যবহার কর?

তিশ্রা—তোমাকে আমার ভাল লাগে তাই আপনা হইতে সরল হইয়া যাই।

ভর্গা—তুমি কি সবার কাছেই এই রকম?

তিশ্রা—দূর তা কেন? যে যেমন তার কাছে তেমনি। যে আমায় কঠিন দেখে তার কাছে কঠিন—যে বিশ্বাস করে তার

কাছে বিশ্বাসী, যে অবিশ্বাস করে—তার কাছে অবিশ্বাসী, আমি কিন্তু যা তাই। তুমি আমায় ভাল দেখ, তাই আমি ভাল।

ভর্গা—না ভাই আমি ত তোমায় ভাল দেখি না। তুমি সত্যই ভাল। যে ভাল সবাই তারে ভাল দেখিবেই। তা যাক্, দেখ, তোমার উপরেও আমার অবিশ্বাস আসিয়াছিল।

তিশ্রা—আমি তা জানি। কিন্তু তুমি সেই জন্য আপনাকে আপনি তিরস্কার করিয়াছ। ভর্গা, এই অবিশ্বাস পুরীতে ইহাই সম্ভব।

ভর্গা—তুমি আমায় ক্ষমা করিও।

তিশ্রা—আচ্ছা।

ভর্গা—তুমি ভাই রোজ আসিও?

তিশ্রা—এই দস্যুপুরীতে? যদি কেউ দেখে?

ভর্গা—খুব গোপনে আসিও—দেখ ভাই তোমাকে যেন কত কি বলিতে ইচ্ছা করে।

তিশ্রা—ভর্গা! আমায় কত কি বলিতে ইচ্ছা করে, একবার মা বল না।

ভর্গা—ছি ভাই, যারে ভাই বলি, যারে সখী বলি, তারে কি মা বলা যায়?

তিশ্রা—খুব যায়। ভর্গা আমার কোলে আয়।

ভর্গা মা বলিল আর তিশ্রা ভর্গাকে কোলে লইল।

বড় সুন্দর দেখাইল। চন্দ্রে চন্দ্রিকার মত, সূর্য্যে দীধিতির
...ত ধারা পুনরায় উৎপত্তি স্থানে আসিল। হায়
...খণ্ড জ্ঞান সিন্ধুতে মিশিবে? খণ্ড স্পন্দন

...চ্ছ বিস্মৃতি-ভাব স্মৃতিপথ

আনিতে চাহিল, যেন কোন হারান ধন নিকটে পাইতেছে মনে করিল। ভর্গা কাঁদিতে লাগিল। তিশ্রা ভর্গাকে শান্ত করিলেন। ভর্গা কোল হইতে নামিল—আবার যেন কিছু হৃদয় হইতে সরিয়া গেল—ভর্গা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল তিশ্রা আমি কাঁদি কেন? কি যে যাতনা পাই তাহা ফুটিয়া বলিতে পারি না—কিসের যে অভাব তাহা যেন মনে আসে আসে না। যাহা করি কিছুই ভাল লাগে না, তবু করিতে হয়। যেন কাহারও ভয় করি। তিশ্রা! তুমি ত মা—বল আমি কি করিলে জুড়াইতে পারি? আমি যে জুড়াইতে চাই।

এখনও ভর্গা ঠিক হয় নাই, এখনও ভর্গার যাতনা পূর্ণ হয় নাই। তিশ্রা কিছু কাল নীরবে রহিল। পরে বলিল চল আমরা একটু দেখিয়া আসি—এখন কেহ কোথাও নাই।

ভর্গা—কোথায় যাইব?

তিশ্রা—যেখানে আছ একবার ভাল করিয়া দেখিবে না? তিশ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন ভর্গা বিনা বাক্যব্যয়ে তিশ্রার সঙ্গে চলিল।

তিশ্রা একে একে ভর্গাকে দস্যুর গুপ্ত স্থান সমস্ত দেখাইল। ভদ্রা বাহির হইতে দেখিয়া বেশী একটা বুঝিতে পারে নাই, এখন নরক দর্শন করিয়া বড় কষ্ট পাইতে লাগিল। তিশ্রা বলিতে লাগিলেন—"আপনাকে আপনি কে না জানে? কিন্তু লোকে কেমন সাজিয়া থাকে? ভিতরে দুর্গন্ধময় গলিত ক্ষত, আর বাহিরে নানা প্রকার আবরণ! এখানকার প্রতি স্থান, এখানকা- প্রতি লোক, ভর্গা, এইরূপ।" ভর্গা এখন সমস্ত আ-
বুঝিল। ভর্গা বুঝিল, এই দস্যুগৃহে য-
মানবাকারে পিশাচ। মুখ দেখিে-
চিহ্নে চিহ্নিত। হিংসাতেই ই-

ইহারা নিতান্ত নির্ম্মম। ইহারা জোর করিয়া—কৌশল করিয়া—বাধ্য করিয়া লোককে আপনাদের মত করিতে চায়। তুমি ইচ্ছা কর বা না কর—তোমার সুখ হউক বা না হউক—আমি যাহা বলিতেছি তাহাই তোমাকে করিতে হইবে। ইহারা জীবের জীবনকে কিছুই গ্রাহ্য করেনা। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধিজন্য হাসিতে হাসিতে ইহারা জীবহত্যা করে। মৃত্যু যাতনায় জীব যখন ছটফট্ করে তখন ইহারা আনন্দে হাস্য করে। আবার প্রাণীর রক্তাক্ত মুণ্ড হস্তে লইয়া ইহারা স্পর্দ্ধা করে, কিরূপে হত্যা করিয়াছে, কিরূপে আনন্দে তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। ইহাদের হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র নাই। ইহারা বুঝে না জলে স্থলে যে সমস্ত নিরীহ জীব বাস করে, যাহারা বৃক্ষের ফলপত্র খায়, সরোবর নির্ঝরিণীর জল পান করে, মাঠে তৃণ আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, পুষ্করিণীর মৃত্তিকা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, যাহারা কাহারও অনিষ্ট করে না, এই দস্যুগণ বিনা সঙ্কোচে তাহাদের জীবন নাশ করে; ইহাদের আত্মার কল্যাণ জন্য ইহারা একবারও ভাবে না। মৃত্যু কালে পশু ইহাদের শরণাপন্ন হইতেছে, ইহা জানাইলেও, এই দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ জীব বিনাশে পশ্চাৎপদ হয় না। পরম সুখে ইহারা বধকার্য্য সম্পাদন করে।

দেখিতে দেখিতে ভর্গার শোক, ঘৃণা, ক্রোধ, জাগিতেছে। তিশ্রা ভর্গাকে এক ভীষণ স্থানে আনিল। ভর্গা আর যাইতে চায় না, আর যাইতে পারে না। তিশ্রা ভর্গার দৃষ্টি আকর্ষণ

ভর্গা ক৩..

দেশ মত চলিতে ৫েকি এ ভীষণ দৃশ্য? কোথাও অসংখ্য মৃত তথাপি ভর্গা বুঝিল এ স্থান হরিয়া কর্ত্তিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার কেহই নয়, তাহার স্থান অন্যত্র' নিকর এই রক্তাক্ত ভূমিতলে

নিরন্তর ভ্রমণ করে—মৃত জন্তুর আর্দ্র অন্ত্র তন্ত্রী চারি ধারে বিক্ষিপ্ত, দিবাভাগে এই সমস্ত শুষ্ক করিতে দেয়, বায়সাদি বিহগকুল আসিয়া তাহার উপর উপবেশন করে। কোথাও বসা রাশি, কোথায়ও রক্তাক্ত আর্দ্র চর্ম্ম, কোথায় পুঞ্জীকৃত অস্থিরাশি, কোথায় লালা মিশ্রিত অন্নমাংসাদির উদ্গার। কত কৃমি কীট আবার সেই অজীর্ণ দ্রব্য মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। আর কত প্রাণী সেই বমন ভক্ষণ করিতেছে।

ভর্গা আর সহ্য করিতে পারে না। তিশ্রাকে বলিল এ কোন্ স্থানে তুমি আমায় আনিলে? কেন আনিলে? আমি যে আর এক মুহূর্ত্তও এ ভয়ঙ্কর স্থানে থাকিতে পারিতেছি না। তিশ্রা তুমি আমায় উদ্ধার কর।

তিশ্রা বলিতে লাগিল—যখন তুমি দস্যুর হস্তে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ছিলে, তখন দস্যু তোমায় এই ক্লেদপূর্ণ দ্বার দিয়া ভিতরে লইয়া গিয়াছিল। অজ্ঞান অবস্থায় তোমাকে ঐ কদুষ্ট ক্লেদ জলে স্নান করাইয়াছে, এতদিন তোমাকে ঐ কদর্য্য বস্তু কৌশল করিয়া আহার করাইয়াছে—তাই আজ তোমার আত্মবিস্মৃতি। তুমি ভুলিয়াছ তুমি কে?

কদর্য্য আহার, কদর্য্য আচার, কদর্য্য বাক্য ব্যবহার, কদর্য্য স্থানে বাস—এই সমস্তে মানুষের যত শীঘ্র অধঃপতন হয় এত আর কিছুতেই হয় না। ভর্গার তাহাই হইয়াছিল। ভর্গা বুঝিল, তাহার কোন অপরাধের জন্য তাহার এই শাস্তি। হইতে

ভর্গা ও তিশ্রা তখন গৃহে আসিল। গৃহে

ভর্গা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, তিশ্রা তুমি কি ম?

ইলে—ও ভয়ঙ্কর স্থানে আর আমি মন তার কাছে তেমনি। যে

যাইতে বল? কাছে কঠিন—যে বিশ্বাস করে তার

এখনও ভর্গার কাল পূর্ণ হয় নাই। তিশ্রা ভর্গাকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিল। শীঘ্রই ভর্গা মুক্ত হইবে।

ভর্গা বড় কাতর হইয়াছে; বলিল সখি! এখন আমার জীবনসংশয় ঘটিবে। তুমিত এখনি যাইবে, তোমার আগমন কাল পর্য্যন্ত হয়ত আমি এই জীবন রাখিতে পারিব না। ভর্গা কাঁদিতে লাগিল। ভর্গার কাতরতা পূর্ণ হইয়াছে। তিশ্রা ভর্গাকে আবার কোলে লইলেন। ভর্গা কি যেন কি হইয়া যাই-তেছে। ভর্গা পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছিল। সেই সময় তিশ্রা বলিল আমায় দেখ দেখি।

ভর্গাকে দেখিতে হইল না। কোলে থাকিয়া ভর্গা কি যেন কি দেখিল। তখন তিশ্রা ভর্গার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। ভর্গা যেন কি পাইল। তিশ্রা বলিল—দেখ তুমি আজ যাহা দেখিলে এইরূপ করিয়া তাহা লইয়াই থাকিও। আমি শীঘ্রই আসিব। তিশ্রা বিদায় লইতে চায়—যাবার সময় বলিয়া গেল আমার কোলে বসিয়া ভিতরে দেখিতে দেখিতে যাহা শিখাইলাম তদ্রূপ করিও। তিশ্রা চলিয়া গেল। সান্ত অনন্তের কোলে বসিয়া সর্ব্বদা অনন্তকে কবে দেখিতে শিখিবে? অনন্ত দেখিয়া দেখিয়া কবে মানব, ক্ষুদ্র পৃথিবীর ভাগাভাগী দেখিয়া পিপীলিকা গণের স্ব স্ব স্থান অধিকার চেষ্টার মত ক্ষুদ্র পৃথিবী অধিকারকে অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা করিবে? এখানে আস্থা করিবার কিছুই নাই স্থির জানিয়া ব্যবহারিক কর্ম্ম-দ্বারা সেই অনন্তে মিশিতেই চেষ্টা করিবে?

ভর্গা কতক্ষণ বিভোর অবস্থায় রহিল। প্রত্যহ তিশ্রার উপ-দেশ মত চলিতে চেষ্টা করিল। কভু হইত, কভু হইত না। তথাপি ভর্গা বুঝিল এ স্থান তাহার স্থান নয়—এখানকার লোক তাহার কেহই নয়, তাহার স্থান অন্যত্র। সেখানে তাহার পতি আছে।

ভর্গা একটু একটু যেন পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে পারিল। ভর্গা কতই কাঁদিত। হায় আমি কি অপরাধ করিয়াছিলাম। কেন আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি জাগিয়াছিল! ভর্গা দিন গণিতে লাগিল।

আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দোল পূর্ণিমা আসিল। ভর্গা পূর্ব্ব হইতেই সেই দস্যুপুরীর লোকের সহিত লৌকিক ব্যবহারে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—সে কেবল আত্মোদ্ধার জন্য। সংসার কৌশলে মানুষের ধর্ম্ম শিথিল করিয়া তাহা দ্বারা আপনার কার্য্য করাইয়া লয়। সেইরূপ মানুষও যখন কৌশল করিয়া সংসারকে ফাঁকি দিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে, তখন সে আপনাকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ভর্গা সংসারের সহিত চাতুরী খেলিতে লাগিল।

আজ সমস্ত দিন ভর্গা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া সকলের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে যোগ দিল। কেহ আর ভর্গাকে "পর" ভাবিল না, মনে করিল ভর্গা তাহাদের "গণ"। ভর্গা মনে মনে হাসিল।

দিনমান কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া উদিত হইলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় তিশ্রা একবার দেখা দিয়া গেল। বহুলোকের সহিত তিশ্রা আসিয়াছিল। তিশ্রা একটিও কথা কহিল না, কেবল ইঙ্গিতে জানাইয়া গেল প্রস্তুত থাকিও। ভর্গা সে ইঙ্গিত বুঝিল। যাহারা ভর্গার নিকটে আসিয়াছিল তাহারা কতক্ষণ আমোদ প্রমোদের কথা কহিল। ভর্গা সকলকে সন্তুষ্ট করিল। ক্রমে একে একে যে যার স্থানে গেল। ভর্গা একাকিনী।

রাত্রি প্রহরাতীত হইল—দেখিতে দেখিতে চারিদিক নিস্তব্ধ হইল; এখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। দস্যুর কোলাহলময় পুরী

এখন নিঃশব্দ হইল। ভর্গা সময় অপেক্ষা করিতেছে। "পততি পতত্রে" অবস্থা ভর্গার। এমন সময়ে তিশ্রা আসিল। ভর্গা নিমেষ মধ্যে সজ্জিত হইল। তিশ্রা এক গুপ্ত দ্বারের নিকট আসিল। কৌশল করিয়া দ্বার খুলিল। তখন উভয়ে এক অন্ধকার পথে চলিল। তিশ্রা ভর্গার হস্ত ধরিয়াছে—ভর্গা নিঃশব্দে তিশ্রার সঙ্গে চলিতেছে। ভর্গা বুঝিল, তিশ্রা কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া ভর্গাকে কোন এক নিম্ন প্রকোষ্ঠে আনিল।

উভয়ে তখন এক দ্বারের নিকট আসিল। দ্বারের উপরেই একটি চক্র। তিশ্রা চক্রে মৃদু মৃদু আঘাত করিল। তিনটি তন্ত্রী বদ্ধাবস্থায় ছিল। মৃদু আঘাতে তন্ত্রীগুলি পৃথক হইয়া গেল—অমনি দ্বার খুলিল। ভর্গা ও তিশ্রা তখন মধ্যের তন্ত্রী অবলম্বনে গৃহে প্রবেশ করিল। আর গৃহের দ্বার আপনা হইতে আবার রুদ্ধ হইয়া গেল।

তিশ্রা বলিল, ভর্গা, আর কোন ভয় নাই। এখন আমি যাহা করিব তুমিও তাহাই করিও। ভর্গা কোন কথা কহিতে পারিল না, চক্ষে কৃতজ্ঞতা ভাসিয়া উঠিল।

ভর্গা তিশ্রার সঙ্গে গৃহের যে স্থানে আসিল—আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে বড় আশ্চর্য্য মানিল। দেখিল তিশ্রা ঊর্দ্ধে এক অগ্নিময় ঘূর্ণমান চক্রের মধ্যে এক সূক্ষ্ম পথে যাইবার জন্য ভর্গাকে ডাকিতেছে। তিশ্রা বলিতেছে ভয় করিও না, আমি যাহা করিব তাহাই করিও। এই অগ্নিময় চক্র পার হইয়া উপরে উঠিতে হইবে। এইরূপ ছয়টি চক্র পার হইতে হইবে, তখন ভর্গা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব।

তিশ্রা অগ্নিচক্রে প্রবেশ করিল, ভর্গাও অনুসরণ করিল। ভর্গার মনে হইল যেন অগ্নিতে তাহার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ হইয়া

যাইতেছে। অগ্নি পার হইবা মাত্র ভর্গা যেন বড় পবিত্র হইল, যেন অগ্নিশুদ্ধ হইল। ভর্গার মনে হইল, যেন দেহের মলিন স্থূল অংশ পরিশুদ্ধ হইল। ভর্গা বড় উৎসাহে তিশ্রার সহিত উপরে উঠিতে লাগিল। পথে কত বিশুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিল। আনন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া ভর্গা বড় আনন্দ অনুভব করিল।

ভর্গা ও তিশ্রা আরও পাঁচটি চক্র ভেদ করিয়া আসিল। ভর্গা দেখিল তাহার দেহের অপবিত্রতা কাটিয়া গিয়াছে। যেন স্থূল আর কিছুই নাই। পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ এই ভূতাংশ সমূহ শুদ্ধ হইল। আর ভর্গা যেন আপনা হইতে উপরে উঠিতে লাগিল। শুদ্ধ হইলে কি জীব আপনা হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হয়?

ক্রমে ভর্গা যেন কোন পরিচিত স্থানের নিকটে আসিল। আবার হৃদয় উদ্বেল হইল। ভর্গা পুনঃ পুনঃ তিশ্রার দিকে চাহিতেছে। কি যেন কি দেখিতেছে, ভাবিতেছে কে এ! কে এই তিশ্রা? তিশ্রা "মা"? ভর্গা কিছুই বলিতে পারে না। তিশ্রাও কোন কথা কহিল না। এক এক বার তিশ্রা ভর্গারদিকে বড় সাগ্রহে চাহিতেছিল। কত আনন্দে যেন চক্ষু কথা কহিতেছিল।

উভয়ে এখন যেন কতদূরে আসিয়াছে। যেন পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—ইহাদের অতি সূক্ষ্ম স্বরূপ প্রদেশ পার হইয়া আসিল। আবার সেই নদী। নদীর উপর সেতু, সেতু পার হইয়া পরিখা। পরিখার পরেই প্রাচীর। প্রাচীর পার হইয়া উভয়ে সেই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল।

উদ্যানে প্রবেশ করিবা মাত্র ভর্গার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিতেছে। ভর্গা কাঁদিতেছে। তিশ্রা ভর্গার হাত ধরিল। ভর্গা শিহরিয়া উঠিল, সেই স্পর্শ!

তুমি? না না তিশ্রা? তিশ্রা কে তুমি? তিশ্রা তুমি আমায় পরিচয় দাও। হায়! আমি বড় অপরাধ করিয়াছিলাম। হায়! আমি কতদিন ছাড়িয়া আছি! আমি আছি কিরূপে? হায় সে কোথায়? আমার প্রাণের দেবতা—আমার পরাণ পুতুলি? তারে ছাড়িয়াও আমি বাঁচিয়া আছি!

তিশ্রা কোন কথা কহে না। আনন্দ কাননে আনন্দ তরু। আনন্দ তরুশাখে আনন্দময় পাখী আনন্দে গান গাইতেছে, তিশ্রা ও ভর্গা উদ্যানের মধ্য স্থানে আসিল। আবার সেই চন্দ্রকলা। ভর্গা একবার দেখিল—দেখিল চন্দ্রকলা বিস্তৃত হইয়া কোন এক অনন্ত প্রদেশে যেন মিশিয়াছে। চন্দ্রকলার উপরেই সেই বৃক্ষ। বৃক্ষতলে সেই মন্দির। ভর্গা ও তিশ্রা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আবার তিশ্রা ডাকিল "ভদ্রা?" আহা "আমিই সেই"। আমি ভদ্রা—আমি তোমারই—"প্রাণাধিক কোথায় তুমি" তুমি আমার জন্য—

আমি "মা"। আবার শব্দ হইল "ভদ্রা"—

ভদ্রা আবার বলিল "প্রাণেশ্বর"!

তিশ্রা বলিল আমি "মা"।

ভদ্রা বড় আগ্রহে বলিল "মাই আমার প্রাণেশ্বর"। ভদ্রা যেমন আলিঙ্গন করিতে হস্ত প্রসারণ করিল—ভদ্রার মনে হইল আবার ভদ্রা ভদ্রা বলিয়া কে ডাকিতেছে। ভদ্রা ভিতরে থাকিয়া আটকাইয়া গিয়াছে। ভদ্রা ভিতরে চেষ্টা করিল, চেষ্টা করিতে করিতে বাহিরে সজাগ লইল।

আর স্পষ্ট শুনিল অর্জ্জুন ডাকিতেছেন "ভদ্রা"। ভদ্রা দ্রুত-

পর্দে আসিয়া দ্বার খুলিল। ভদ্রার দীর্ঘ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে ঘুমের ঘোর কিন্তু ছুটে নাই।

ভদ্রা দ্বার খুলিল, বড় কাতর হইয়া অর্জ্জুনের বক্ষে মস্তক রাখিল। অর্জ্জুন বুঝিলেন ভদ্রার সমস্ত শরীরে যেন কোন একটা ভাবের ক্রিয়া হইতেছে। ভদ্রা কতক্ষণ পরে বলিল প্রাণাধিক—আর আমি কখন তোমার অবাধ্য হইব না—বল আমায় ক্ষমা করিলে? অর্জ্জুন কিছুই বুঝিলেন না—ভদ্রা তখন অর্জ্জুনকে দীর্ঘ স্বপ্নের কথা বলিল, তুমিই তিশ্রা—অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইলেন।

দোল পূর্ণিমার রাত্রি শেষ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ ও সত্যভামা আসিলেন—আরও দাস দাসী কত আসিল। সেই দিনেই ভদ্রা অর্জ্জুন সঙ্গে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন।

ভদ্রা চরিত্র শেষ হইল। ভারত মহিলার হৃদয়ে ভদ্রা প্রবিষ্ট হইয়া পতিনারায়ণ-ব্রত প্রতিষ্ঠা করুন, ইহাই ভদ্রার নিকট প্রার্থনা।

সুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিচিত্রবস্ত্রসংচ্ছন্নাং হারকেয়ূরশোভিতাং॥
বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহারবিলম্বিতাং।
পীনোন্নতকুচাং রামাং আদ্যাপ্রকৃতিরূপিকাম্॥

সমাপ্ত।